বিয়ে

মাহমুদা ইসলাম

ভাষা-শহীদ

গ্রন্থমালা

বিয়ে

মাহমুদা ইসলাম
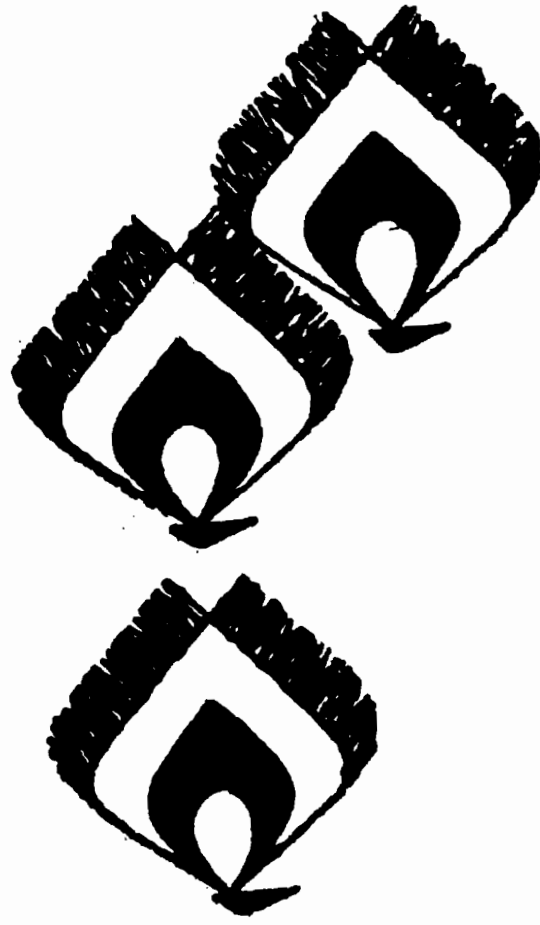
বাংলা একাডেমী ঢাকা

ভাষা-শহীদগ্রন্থমালা

বাএ ৩৩৪০

প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৯২/ডিসেম্বর, ১৯৮৫। পাণ্ডুলিপি : সংকলন উপবিভাগ। প্রকাশক : পরিচালক গবেষণা সংকলনও ফোকলোর বিভাগ ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা। প্রথম পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৪০২/ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬। প্রকাশক : মুহম্মদ নূরুল হুদা, পরিচালক, প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ, [পুনর্মূদ্রণ প্রকল্প] বাংলা একাডেমী, ঢাকা। মুদ্রক : প্রকাশ ২/২ পুরানা পল্টন। প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী। মুদ্রণ সংখ্যা : ২২৫০ কপি। মূল্য : ৫০.০০ টাকা।

BHASHA-SHAHEED GRANTHAMALA : Series in honour of the martyrs of the Language Movement of February 1952.

BIYE [Marriage] By Mahmuda Islam. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First Reprint : February 1996. Price : TK. 50.00 only.

ISBN 984-07-3349-4

উৎসর্গ

আমার ভাই
লুৎফর রহমান খান-এর
স্মৃতির উদ্দেশে

পুনর্মুদ্রণ প্রসঙ্গে

বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও গবেষণায় নিয়োজিত বাংলাদেশের জাতীয় প্রতিষ্ঠান বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও বটে। ১৯৫৭ সাল থেকে বাংলা একাডেমী গ্রন্থ প্রকাশ করে আসছে। জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় একাডেমী এ-যাবৎ প্রায় সাড়ে তিনহাজার গ্রন্থ প্রকাশ করেছে। এই বিপুল গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও ছাত্রসমাজের কাছে বিশেষভাবে আদৃত হয়েছে। পাঠকনন্দিত এইসব বই বাংলা একাডেমী পরিকল্পিতভাবে পুনর্মুদ্রণ করে চলেছে। ১৯৯১ সাল থেকে পুনর্মুদ্রিত গ্রন্থসমূহের প্রকাশনার যাবতীয় কাজ কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক গঠিত 'পুনর্মুদ্রণ প্রকল্প'-এর অধীনে নিষ্পন্ন হয়ে আসছে।

জনাব মাহমুদা ইসলাম প্রণীত 'বিয়ে' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। গ্রন্থটি বাংলা একাডেমী প্রকাশিত ভাষা-শহীদ গ্রন্থমালা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহ শুধু আমাদের সমাজে নয়, সকল দেশে এবং সকল সমাজে মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিয়ে দুটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের সূচনা করে তার সঙ্গে অন্য কোনো সামাজিক বন্ধনের তুলনা হয় না।

লেখক এই গ্রন্থে আদিযুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত দেশ বিদেশের বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন সময়ে বিয়ের রীতি-প্রথা-আনুষ্ঠানিকতা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য ভিত্তিক বর্ণনা সন্নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থটি পাঠক সমাজে সমাদৃত হয়েছে।

এই গ্রন্থ আগের মতো পাঠক সমাজের চাহিদা পূরণ করবে এই আমাদের বিশ্বাস।

মনসুর মুসা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

প্রসঙ্গ-কথা

বাহান্নোর ভাষা-শহীদেরা মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর দেখতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে তার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন। জ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে বাংলা ভাষায় অবাধ বিচরণ আজো স্বপ্ন। এ স্বপ্নকে খানিকটুকু হলেও সত্য ক'রে তোলার এক বিনীত চেষ্টা থেকে এ গ্রন্থমালা।

বাংলা একাডেমী সকলের একাডেমী। সবারই দাবি এর উপর। এ গ্রন্থমালার বই তাই সবার জন্যে। কেবল বিশেষজ্ঞের জন্যে নয়, কেবল শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। নানা বিষয় নিয়ে এ গ্রন্থমালা — জ্ঞানের সব দিগন্তই যেন একদিন ছুঁতে পারি, এই আমাদের প্রার্থনা। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের অনেকেই এই প্রথম বারের মতো লিখলেন কিংবা এই প্রথম বারের মতো বাংলায় লিখলেন। আমাদের চিন্তার ভুবনে নতুন কণ্ঠ বড়ো প্রয়োজন।

এক সময় বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠান মানুষের অজানা ছিলো। আজ পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলোতে কেউ-কেউ এ প্রতিষ্ঠান বর্জনের পক্ষপাতি। এ-প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এ-বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এ গ্রন্থমালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মী ও অন্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। ভাষা-শহীদদের বারবার শ্রদ্ধা জানাই।

মনজুরে মওলা
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমী

সূচিপত্র

বাংলাদেশের বিয়ে

আমাদের সমাজে বিয়ে-একটি আনন্দমুখর ঘটনা। যদিও বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা বিরল নয়, তবে সাধারণত একজোড়া তরুণ–তরুণীর মধ্যে বিয়ে হয়। তরুণকে বলে বর তরুণীকে বলা হয় কনে।

বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে ছোট–বড় সবাই আমরা কমবেশি পরিচিত। কনের পিতৃগৃহে বিয়ের অনুষ্ঠান সংঘটিত হয়। আনন্দের প্রতীক হিসেবে বিয়ে বাড়িতে তোরণ সাজানো হয় এবং আলোক–সজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। কনের পিতার সামর্থ্য অনুযায়ী সামিয়ানা এবং উপাদেয় ভোজের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

বিয়ের অনুষ্ঠানে আত্মীয়–স্বজন ও বন্ধুবান্ধব আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা মিছিল করে বিয়ের আসরে উপস্থিত হয়। বরযাত্রীর আগমন আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করে। ছেলে–মেয়েরা রঙবেরঙের নতুন পোষাক–গায়ে বরের আগমনের প্রতীক্ষায় থাকে, বরযাত্রী আসার সংবাদ পেয়ে তারা সদলবলে ফটকে জমা হয়ে পথ আগলে রাখে। বিনা দর্শনীতে বরকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। হাস্য–উৎফুল্ল দর কষাকষির পরে বরপক্ষ মোটা দর্শনী খেসারত দিয়ে আসরে প্রবেশের অধিকার আদায় করে। চিনি মুখে দিয়ে বরকে বরণ করে নির্দিষ্ট মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। বরকে ঘিরে রাখে তার বন্ধুবান্ধব। কনের ছোট বোন বরের জন্য সুমিষ্টশরবত নিয়ে আসে। বোনের হাতে কনের পরশ কল্পনা করে বর শরবতের গ্লাস মুখে তোলে এবং কড়া লবণের

স্বাদে মুখ বিকৃত করতে বাধ্য হয়। এভাবে কনে পক্ষের সঙ্গে বর পক্ষের ঠাট্টা তামাশার সূচনা হয়।

বিয়ে পড়ানোর জন্য কাজি সাহেব রেজিষ্ট্রারি খাতা নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন। রেজিষ্ট্রারি খাতা খুলে তিনি বর-কনের নামধাম এবং বিয়ের শর্তাদি, দেনমোহরের পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করেন।

বিয়েতে মেয়ের সম্মতি গ্রহণের জন্য একজন উকিল এবং দুজন সাক্ষী নিয়োগ করা হয়। যার সম্মতি প্রয়োজন সেই কনে থাকে অন্দর মহলে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন পরিবৃত হয়ে। কনেকে শিঙ্গারে উপচারে সাজিয়ে মোহনীয় করে তুলবার মহড়া চলে সেখানে। উকিল ও সাক্ষী কনের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহে সম্মতি চান, তিনবার স্পষ্ট বাক্যে মেয়েকে সম্মতি দিতে হয় যাতে উপস্থিত উকিল ও সাক্ষী তা বুঝতে ও শুনতে পারেন। শুধু মাথা নেড়ে সম্মতি প্রদান যথেষ্ট নয়।

কনের সম্মতি বেশ শক্ত ব্যাপার। তড়িঘড়ি হ্যাঁ বলে দেওয়া বড় লজ্জার, কোনো মেয়েই তা করে না। বয়স্ক মহিলারা মেয়েকে সম্মতি দানের জন্য সাধ্য সাধনা করেন। শেষ-মেষ অশ্রু সজল কণ্ঠে মেয়ে সম্মতি প্রদান করে। উপস্থিত সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচে, কনে বিয়ের একটি উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ধাপ পার হয়।

এবার বরের পালা। একইভাবে উকিল বরের নিকট মেয়ের সম্মতি উল্লেখ পূর্বক বিয়ের প্রস্তাব পেশ করেন। বরকে তিনবার সম্মতি দিতে হয়। লজ্জা নারীর ভূষণ, পুরুষের নয়। কাজেই বরের অনুমোদন পেতে দেরি হয় না। বর তিনবার সম্মতিসূচক বাক্য উচ্চরণ করা মাত্র বিবাহ সংঘটিত হয়। সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগতভাবে এখন থেকে বর-কনে স্বামী ও স্ত্রী, জায়া ও পতি, দম্পতি।

উপস্থিত অভ্যাগতদের শুভেচ্ছা ও আর্শীবাদে বিয়েকে সুখী ও চিরস্থায়ী করবার উদ্দেশ্যে বিয়ের পরে ভোজের আয়োজন করা হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পরে অভ্যাগতরা এক এক করে প্রস্থান করেন। কেবল বর ও কনের নিকটাত্মীয়রা থেকে যান।

এবার বরকনের মুখ দেখাদেখির পালা। গুরুজনরা বার বার তাগাদা দেন। কিন্তু মেয়েমহল তৈরি নন। মেয়েকে বরের মনের মতো করে সাজাতে হবে। কিন্তু সে সাজ যেনো শেষ হতে চায় না। অবশেষে বরপক্ষের পীড়াপীড়িতে বরকে ভেতরে নেওয়ার অনুমতি পাওয়া যায়। কিন্তু বর যাবে কি করে? তার অত সাধের নতুন নাগরাটা পাওয়া যাচ্ছে না। জুতো ছাড়া তো বর যেতে পারে না। কাজেই খোঁজ খোঁজ। চোর ধরা পড়তে অবশ্য দেরি হয় না। কনের ছোট ভাই কোনো ফাঁকে জুতো সটকিয়ে ছিল। এখন জুতোর দামের ডবল কবুল করে জুতো ফেরৎ নিতে হল। শালাশালির হাতে বরের নাকানি চুবানি সবে শুরু। বর ও কনেকে পাশাপাশি বসিয়ে একটি ওড়না দিয়ে দুজনের মাথা ঢেকে দেওয়া হয়। কনের একজন নিকট আত্মীয়া বর কনের মুখ তুলে ধরে একটি আয়নার মধ্যে পরস্পরের দিকে তাকাতে বলেন। বরতো দেখবার জন্য ব্যগ্র, কিন্তু কনে মুখ তুলতে চায় না। যদিও নতুন সঙ্গিকে দেখার জন্য সে মনে মনে মরে যাচ্ছে তবু মুখ তুলে তাকানো বড় লজ্জা। বিয়ের প্রতি অনুষ্ঠানে কনের লজ্জার পরীক্ষা দিতে হয়, কোনও খুঁত হলে, বাড়াবাড়ি হলে, দশজনে কানা-কানি করে, মেয়ের বেলেল্লাপনার সমালোচনা হয়। কাজেই মেয়ের মুখ টেনে তুলতে হয়। মুখ তুললেও চোখ কিন্তু খুলতে চায় না। জীবন সঙ্গিনীর চোখ দেখা না গেলেও শুধু মুখ দেখেই আংটি উপহার দিতে হয়। কাজেই বর কনের আঙ্গুলে আংটির পরিয়ে দেন। এই প্রথম স্পর্শ। আংটি মূল্য দিয়ে এই স্পর্শের মূল্যায়ন করা যায় না।

এতক্ষণ যা ঘটলো তার মধ্যে আনন্দ ও হর্ষই প্রধান। বিয়ে বাংলাদেশের পরিবারে সম্ভবত সবচেয়ে আনন্দময় উৎসব।

কিন্তু এই আনন্দের মধ্যে আছে প্রিয়জনের বিদায়ের বিষাদ। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায় কনেকে বিয়ের পরে বরের গৃহে গমন করতে হয়। যে গৃহে পিতামাতা ভাইবোন আত্মীয়-স্বজনের প্রিয় সান্নিধ্যে তার

শৈশব ও কৈশোর এবং যৌবনের একটি অংশ অতিবাহিত হয়েছে, সেই অতি পরিচিত, অতি নিকট পরিবেশ ত্যাগ করে মেয়েকে যেতে হবে একটি নতুন গৃহে, যেখানে সম্ভবত সবাই অপরিচিত। বিয়ের শেষ-অনুষ্ঠানটি তাই বেদনা-বিধুর।

বাংলাদেশের সমাজে সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার বিয়ে দেওয়া পিতা-মাতা অবশ্য কর্তব্য মনে করেন। পুত্র-কন্যার বিয়ে দিতে না পারলে তাঁদের সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। তাই সন্তানের বিবাহ পরিবারের জন্যে আনন্দ-উৎসব। কিন্তু কন্যাকে বিদায় দানের ক্ষণে আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে বিচ্ছেদ ও বেদনার অনুভূতি। কন্যাকে পিতামাতা আর তেমন করে পাবেন না, কন্যা যেন চিরদিনের জন্য পর হয়ে গেল, কন্যা যে নতুন জীবনে প্রবেশ করেছে তা কল্যাণ বয়ে আনবে কিনা সে দুশ্চিন্তা পিতামাতাকে উদ্বিগ্ন করে। তাই বিদায়ের লগ্নে পিতা কাঁদেন, মাতা কাঁদেন।

কনেও কাঁদে, এতকালের পরিচিত আপনজনদের ছেড়ে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অনিশ্চিত পরিবেশে যাওয়ার মধ্যে যে দুঃখের আবেগ তা বড় সত্য হয়ে বাজে।

বিবাহ শুধু আমাদের সমাজে নয়, সকল দেশে এবং সকল সমাজে মানুষের জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিয়ে দুটি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্কের সূচনা করে তার সঙ্গে অন্য কোনো সামাজিক বন্ধনের তুলনা হয় না। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের বা ভাইবোনের যে পারস্পরিক সম্পর্ক, দম্পতির সম্পর্ক তার চেয়ে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ, নিবিড় ও একান্ত। স্বামী স্ত্রী পরস্পরের যত কাছাকাছি, অন্য কোনো দুটি মানুষ অত কাছাকাছি কখনও আসতে পারে না। পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মধ্যেও কিছুটা আড়াল থাকে, কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ নেই। তারা একজন আর একজনের সঙ্গে চিরতরে একসূত্রে আবদ্ধ। সমাজে মনে করে তারা তাদের সম্পর্কের

নিবিড়তার মাঝখানে হবে একমন একপ্রাণ। তাদের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ।

বিয়ের আগে সন্তানের ভালোমন্দের প্রহরী ছিলেন পিতামাতা। সন্তানের সুখ-দুঃখ ও সমস্যা নিয়ে পিতামাতা মাথা ঘামাতেন। কিন্তু বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের ভালোমন্দের ভাগীদার। পিতামাতার পরামর্শ হয়তো নেয়া যায়। কিন্তু নিজেদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব এখন স্বামী-স্ত্রীর একান্তভাবে নিজেদের। বিয়ের পরে দুটি মানবসন্তানের ভবিষ্যৎ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়ে যায়। একজনের উপর যদি কালো মেঘের ছায়া পড়ে তবে তা অপর জনকেও ঢেকে দেয়। একজনের ভালোমন্দ অন্যজনকে প্রভাবিত করে। স্বামীর দু:খ স্ত্রীর দুঃখ, স্ত্রীর সুখ স্বামীর সুখ। বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন পিতামাতা সুখের দিনে আনন্দ প্রকাশ করেন, দুঃখে সমাবেদনা জানান। কিন্তু সুখ ভোগ এবং দুঃখ-বহন স্বামী-স্ত্রীকেই করতে হয়।

দম্পতি বিয়ের পরে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন কিভাবে গড়ে তুলবে সে সিদ্ধান্ত তাদেরই নিতে হবে। পিতামাতা বন্ধুবান্ধব পরামর্শ দেবেন, ভরসা দেবেন, প্রয়োজনে সহায়তা দেবেন । কিন্তু সকল সিদ্ধান্তের ফলভোগ করবে দম্পতি, কাজেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থাকবে তাদের হাতে।

বরকনের এই নিবিড় সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি ঘটে বাসর ঘরে। ক্রন্দনরত কনেকে নিয়ে বর ও বরের আত্মীয় স্বজন বরের পিতৃগৃহে আগমন করলে মাতা মিষ্টিমুখ করে কনেকে বরণ করেন। বরকনের জন্য ফুল দিয়ে বাসর ঘর সাজানো হয়। শয্যা ফুলে ফুলে ভরে দেওয়া হয়। বর-বধূকে ঐ বাসর ঘরে পৌছে দিয়ে আত্মীয় স্বজন সরে আসেন। এতক্ষণ চলছিল যত সামাজিক অনুষ্ঠান, এবার সামাজিক অনুষ্ঠানের শেষ পরিণতি স্বামী-স্ত্রীর একান্ত মিলন। এই বাসর-ঘরে তৃতীয় কোনো ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। এই বাসর বরকনের একান্ত জীবনের প্রারম্ভ, এ ঘরে প্রবেশ করে তারা প্রথমবারের মতো অনুভব করে যে, তাদের মধ্যে এমন একটি সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যা তাদের নিজস্ব, একেবারে নিজস্ব,

এখানে স্বামী ও স্ত্রী ছাড়া আর কেউ অংশীদার নেই। আজ থেকে তারা দুজন দুজনার, দুজন দুজনার ঘনিষ্ঠতম সাথী, সুখ-দুঃখের ভাগীদার। এই বাসর-ঘরে তারা যেমন ভাবে কাছাকাছি এসেছে, এই বন্ধব তাদের আজীবনের বন্ধন, তারা আজীবনের সঙ্গি।

দুটি তরুণ- তরুণির মধ্যে আজীবনের নিবিড় বন্ধন সৃষ্টি করে বিয়ে নামক যে সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যে বিয়ে নিয়ে হাসি তামাশা আনন্দে সবাই উচ্চকিত হয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য কি? বিয়ে কেন হয়? দুটি তরুণ-তরুণী বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় কেন? এক কথায় বিয়ের প্রয়োজনীয়তা কি?

প্রয়োজনের প্রশ্ন উঠলে আর একটি প্রশ্ন দেখা দেয়—সৃষ্টির আদিলগ্নেই কি মানুষের মধ্যে বিয়ের প্রচলন হয়েছিল? মানুষ যতদিন হলো পৃথিবীতে বাস করছে ততদিন থেকেই কি বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা পালন করছে? বিয়ে বলতে কি সব সমাজে এবং সব কালে একই অনুষ্ঠানকে বোঝায়? আদিম মানুষের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে আধুনিক মানুষের বিয়ের কোনও পার্থক্য আছে কি? শুধু কালে কালে নয়, দেশে দেশে বিয়ে নামক অনুষ্ঠানটি কি একই রকম? আমরা প্রথমেই বিয়ের যে চিত্র দিয়েছি সেটা বাঙালি মুসলমানের বিয়ে।

আমরা যারা ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি তারা বলবো যে সৃষ্টিকর্তা যেদিন মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেদিনই তিনি বিয়ের বন্ধন সৃষ্টি করেছেন। মুসলমানদের মতে পৃথিবীতে প্রথম মানুষ আদম এবং প্রথম রমণী হাওয়া। খ্রিষ্টানদের মতে অ্যাডাম ও ইভ প্রথম নরনারী। আদম ও হাওয়ার মধ্যে বিবাহ হয়েছিল। অ্যাডাম ও ইভ ছিলেন দম্পতি। ধর্মের দৃষ্টিতে বিবাহ-বন্ধন মানব-সৃষ্টির সমসাময়িক। এ সত্য আমরা সবাই বিশ্বাস করি। কোরআনে বলা হয়েছে, আল্লাহ সকল প্রাণীকে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন।

তবে কিছু জ্ঞান-পাগল লোক সবযুগেই আছেন। তাঁরা গবেষণা আর অনুসন্ধান করতে ভালোবাসেন। গবেষণা আর অনুসন্ধান নিয়েই তাঁরা জীবন কাটান। এদের মধ্যে একদল লোক মানুষের সৃষ্টি, উৎপত্তি ও

বিকাশ নিয়ে তথ্যানুসন্ধান করেন। এদের বলে নৃবিজ্ঞানী এঁরা যে সব তথ্য উদ্ঘাটন করেন এবং যেসব বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন, সেগুলোকে বলে নৃবিজ্ঞান। নৃবিজ্ঞানে মানুষের উৎপত্তি এবং সভ্যতার ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়।

মানুষ কবে থেকে পৃথিবীতে বসবাস শুরু করেছে তার সন তারিখ পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে প্রামাণ্য দলিলের অভাব। অতীত ইতিহাস জানার জন্য তাই নৃবিজ্ঞানীরা আদিম উপজাতির কাছে যান। আফ্রিকায় নানা উপজাতি আছে যারা যুগ যুগ ধরে একই ভাবে জীবন–যাপন করছে। মেলানিশিয়ায় এমন উপজাতি আছে যারা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে কখনও আসে নি। হাজার হাজার বছর আগে তাদের জীবনযাত্রা প্রণালি যেমন ছিল, আজও তেমন আছে। এইসব উপজাতির জীবনযাত্রা বিশ্লেষণ করে নৃবিজ্ঞানীরা মানুষের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করেন।

বিভিন্ন উপজাতির জীবনধারা অবলোকন করে বিভিন্ন নৃবিজ্ঞানী বিয়ে সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য প্রদান করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন সৃষ্টির শুরু থেকেই বিয়ের প্রচলন ছিল। কেউ কেউ বলেছেন, অতি আদিমকালে মানুষের মধ্যে বিয়ে বলতে কিছু ছিল না, কালক্রমে সামাজিক প্রয়োজনে বিয়ের উদ্ভব হয়েছে। বিভিন্ন অনুসন্ধানে দেখা গেছে বিয়ে বলতে আমরা এখন যা বুঝি আদিম মানুষের ধারণা তা থেকে ভিন্ন ছি। বস্তুত বিভিন্ন সমাজে এবং বিভিন্ন যুগে বিয়ের রূপ ও প্রকৃতি ছিল বিভিন্ন।

নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্যগুলো কিন্তু চিত্তাকর্ষক। তবে বলে নেয়া প্রয়োজন যে, আদিমযুগের তথ্য নির্ভর ইতিহাস পাওয়া মুশকিল, কোনো প্রামাণ্য দলিল নেই বললেই চলে। তাই নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে, কোনো একটি মতকে নির্ভুল গণ্য করারও পর্যাপ্ত মাল–মাসলা নেই।

কাজেই বিয়ে সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীদের মতামত আলোচনা করলে ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হওয়ার কারণ নেই। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৃবিজ্ঞানীদের বক্তব্য অনুমান-নির্ভর। বিয়ে সম্পর্কে ধর্মীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেও নৃবিজ্ঞানে বিয়ের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যায়। এতে ধর্ম-বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই।

বিয়ের লক্ষ্য

বাংলাদেশে বিয়ে মোটামুটি সর্বজনীন। বিয়ে না করে কুমার বা কুমারী জীবন যাপন করার ঘটনা বিরল। প্রতি তরুণ-তরুণী মনের মণি-কোঠায় বিয়েই বাসনা পোষণ করে, পিতামাতা সন্তানের বিয়ে দেয়া দায়িত্ব মনে করেন।

বিয়ের গুরুত্ব উল্লেখ করেছি, বিয়ের আমোদ-আহ্লাদ বর্ণনা করেছি বিয়ের সর্বজনীনতার কথাও বলেছি। এই যে বারে বারে 'বিয়ে' 'বিয়ে' করছি, এই বিয়ের মানে কি? বিয়ে বলতে কি বুঝি? কোনো বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনা করার প্রথম সোপান বিষয়টির সংজ্ঞা নির্দেশ করা। সংজ্ঞা এমন হওয়া উচিত যার দ্বারা বিষয়টি সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ ধারণা পাওয়া যায়।

বিয়ের সংজ্ঞা কি

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সহজ নয়। বিয়ের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে নৃবিজ্ঞানীরা হিমশিম খেয়েছেন। কোনও সংজ্ঞাই সর্বজন গ্রাহ্য হয় নি। তাই অনেকে সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করেন নি। দু একটি সংজ্ঞা আলোচনা করা যাক। ওয়েস্টার মার্ক নামে একজন নৃবিজ্ঞানী বলেছেন, বিয়ে পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কমবেশি স্থায়ী এমন একটি সম্বন্ধ যা বংশ বিস্তারের প্রক্রিয়াকে ছাড়িয়ে সন্তান উৎপাদনের পরেও বলবৎ থাকে। এই সংজ্ঞায় আমার বিয়ে

নামক প্রতিষ্ঠানের তিনটি উপাদান পাচ্ছি — যথা, নারী ও পুরুষের মধ্যে সম্বন্ধ, সম্বন্ধের মোটামুটি দীর্ঘস্থায়ীত্ব এবং সন্তান উৎপাদন ও বংশ বিস্তারের সঙ্গে এই সম্বন্ধের নিবিড় যোগ।

বিয়েতে দুটি পক্ষ থাকে — একপক্ষে নারী, আর এক পক্ষে পুরুষ। বর ও কনে ছাড়া বিয়ে হয় না একথা মেনে নিলেও কথা থাকে। বিয়ে কি একজন পুরুষ ও একজন নারীর মধ্যে সম্বন্ধ, না একাধিক পুরুষ ও একাধিক নারীর মধ্যে সম্বন্ধকেও বিয়ে বলে চিহ্নিত করা যায়?

এক স্বামীর এক স্ত্রী এবং এক স্ত্রীর এক স্বামী এই বিয়ে ব্যবস্থা — অর্থাৎ একগামিতা এখন বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী এ ধরনের ব্যবস্থা যাকে বহু পত্নীত্ব বলে তা আজও লোপ পায় নি। আফ্রিকার কোনো কোনো উপজাতিতে এক স্বামীর শতাধিক স্ত্রীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সেই দলপতির কথা আমরা সবাই শুনেছি — যার অনেকগুলো স্ত্রী ছিল এবং যে সবগুলো স্ত্রীকে চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করত। প্রতিদিন সে স্ত্রীদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে দূরে কতগুলো ঢিল নিয়ে বসে থাকত। কোনো স্ত্রী কাজে শৈথিল্য বা ভুল করলে ঐ স্ত্রীকে ঢিল ছুড়ে মারত। মধ্যযুগে রাজারাজড়দের হেরেমে কত স্ত্রী ছিল তার সংখ্যা রাজারাও জানতেন কিনা সন্দেহ। বাংলাদেশেও বহুপত্নীত্ব বিরল নয়।

এখন পাশ্চাত্যের অনেক দেশে এক স্বামীর একাধিক স্ত্রী থাকা আইনত নিষিদ্ধ। এক স্ত্রী বর্তমানে স্বামী অন্য কোনো স্ত্রী ঘরে আনলে তা বিয়ে বলে বিবেচিত হবে না। স্বামী ও তথাকথিত দ্বিতীয় স্ত্রী মধ্যে সম্বন্ধকে বিয়ে বলা যাবে না। পাশ্চাত্যের বিবাহ ব্যবস্থায় এক স্বামী ও এক স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে, বিয়ে ; এক স্বামী ও একাধিক স্ত্রীর মধ্যে বিয়ে, বিয়ে নয়।

এক স্বামীর বহু পত্নীর কথা অর্থাৎ বহু পত্নীত্ব মেনে নিলাম কারণ এ ব্যবস্থা আধুনিক অনেক সমাজেই বলবৎ আছে, কিন্তু বিপরীত ব্যবস্থা অর্থাৎ এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিবাহ কি সম্ভব নয়? এ ধরনের

বলে গণ্য করা হয়। এ ধরনের বিয়েকে নৃবিজ্ঞানীরা প্রেত বিবাহ নাম দিয়েছেন।

এক স্বামীর একাধিক স্ত্রীর সঙ্গে বিয়ে হোক কিংবা এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হোক, উভয় ক্ষেত্রেই বিয়ের সম্বন্ধের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গে উপস্থিতি বিদ্যমান। বিয়েতে পতি হবে পুরুষ এবং পত্নী হবে নারী, এই শর্ত কি অত্যাবশ্যক? মেয়েতে মেয়েতে বা ছেলেতে ছেলেতে কি বিয়ে হতে পারে না?

প্রশ্নটা বোকামী বা উদ্ভট পাগলামি মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু সত্য অনেক সময় নাটক নভেলের চেয়ে বিস্ময়কর হয়ে থাকে। যেসব নৃবিজ্ঞানী উপজাতিদের নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালবাসেন তাদের একদল গিয়েছিলেন আফ্রিকার দাহোমী উপজাতিদের মধ্যে। তারা দেখতে পান যে, কোনো কোনো গৃহে একজন বয়স্ক মহিলা গৃহকর্ত্রীকে ঘিরে রয়েছে নানা বয়সের কতিপয় মহিলা। তারা ভেবেছিলেন এরা ঐ সব মহিলার মা, খালা, ফুফু, ভগ্নী এবং কন্যা হবে হয়া। সন্ধান নিতে গিয়ে তারা জানলেন যে ঐ মহিলারা, ছিল গৃহকর্ত্রীর স্ত্রী। শুনে তো তাদের চক্ষু চড়ক গাছ। মহিলার স্ত্রী মহিলা। একথা ভাবতেও যে অবাক লাগে। কিন্তু ঘটনাকে অস্বীকার করে লাভ কি? ঐ মহিলা-স্বামী তার স্ত্রীদেরকে রীতিমতো সামাজিক নিয়ম এবং বিয়ের রীতিনীতি অনুসরণ করে বিয়ে করেছেন। প্রত্যোকটি স্ত্রীর জন্য মহিলা-স্বামী বিধি মোতাবেক বধূপণ দিয়েছেন। দাহোমী উপজাতির সমাজ ব্যবস্থায় ঐ মহিলারা স্বামীর স্ত্রী হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। বিবাহিত স্ত্রীর উপর একজন স্বামীর যে সকল দায়িত্ব ও অধিকার আছে, মহিলা-স্বামীরও তথাকথিত স্ত্রীদের উপর একই রকম দায়িত্ব ও অধিকার বর্তমান।

জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ সামনে রেখে চোখ বুঁজে থাকি কি করে? মেয়েতে মেয়েতে বিয়ে হতে পারে এসত্য অস্বীকার করি কি করে? তাহলে ওয়েস্টার মার্কের সংজ্ঞার ভিত্তি — ছেলে ও মেয়ের সম্বন্ধ ঠেকানো সম্ভব নয়।

এবার স্থায়িত্বের প্রসঙ্গে আসি। কম বেশি স্থায়ী কথাটি ব্যাপক। এমন উপজাতি আছে যাদের মধ্যে বিয়ে একদিনের বেশি টেকে না। অনেক সমাজে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিয়ে ব্যবস্থার প্রচলন আছে। মেয়াদ শেষ হলে ঐ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া আধুনিক সমাজে ডিভোর্সের ব্যবস্থা আছে। স্বামী–স্ত্রী বনাবনি না হলে বিবাহ বন্ধন রদ করে স্বামী অন্য স্ত্রী এবং স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারে।

হলিউডে বিয়ের ক্ষণস্থায়ীত্ব সম্পর্কে নানা কৌতুক প্রচলিত আছে। এক চিত্রতারকা ঘন ঘন স্বামী বদলাতেন। একবার নতুন স্বামী নিয়ে এসে তিনি কোনো একপক্ষের ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ছেলেটি ছুটে গিয়ে অটোগ্রাফ বই এনে নতুন বাবার সামনে মেলে ধরে বললো,"জলদি একটা সই দিয়ে দিন, কবে আবার হুট করে চলে যাবেন, শেষে সই নেয়ার সময় পাব না,।" ঘন ঘন বিয়েতে অভিজ্ঞ এক তারকা সদ্য বিবাহিত স্বামীর ঘরে এসে দেখলেন সবকিছু খুব চেনা চেনা লাগছে। সন্দেহ বশে তিনি স্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, "বলনা গো, তোমার সঙ্গে কি আমার আগেও একবার বিয়ে হয়ে ছিল?"

ক্ষণস্থায়ী বিবাহের অপর সীমায় আছে চিরস্থায়ী বিবাহ। হিন্দু সমাজে বিবাহ জন্ম জন্মান্তরের বন্ধন। স্বামীর মৃত্যুর পরেও মৃত স্বামী জীবিত স্ত্রীর স্বামী হিসেবে গণ্য হয়, স্বামীর মৃত্যু হলে বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। কাজেই হিন্দু বিবাহে বন্ধন অচ্ছেদ্য। হিন্দু বিধবাদের পুনরায় বিয়ে হতে পারে না তার কারণ বিয়ের চিরস্থায়ীত্ব। মৃত্য স্বামী যদি স্ত্রীর স্বামী থেকে যায়, তাহলে স্ত্রী পুনর্বিবাহের অর্থ এক স্ত্রীর দুই স্বামী। হিন্দু সমাজে এক স্ত্রী একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ। কাজেই হিন্দু বিধবাকে আমরণ মৃত স্বামীর স্মৃতি নিয়ে জীবন যাপন করতে হয়, দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা চলে না।

এ ধরনের জন্ম জন্মান্তর ব্যাপী বিয়ের কথা ছেড়ে দিলে সকল সমাজে এক পক্ষের মৃত্যুতে বন্ধন ছিন্ন হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করতে পারেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিবাহ একটি আমরণ ব্যবস্থা।

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকলেও স্বামী স্ত্রী সাধারণত বিবাহ বন্ধনকে চিরস্থায়ী বন্ধন মনে করতে চায়। এ বন্ধন চিরস্থায়ী হবে, আজীবন স্বামী ও স্ত্রী অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে — সকল তরুণ তরুণী এই আশা নিয়ে বিয়ের আসরে যায়। যারা বিবাহ অনুষ্ঠানে বর বধূকে আর্শীবাদ করার জন্য উপস্থিত হন তাদের আশীর্বাণী একটাই যে, এই বন্ধন যেন চিরস্থায়ী হয়, দীর্ঘস্থায়ী হয়।

ওয়েস্টার মার্কের সংজ্ঞায় বিবাহ বন্ধন সন্তান উৎপাদনের মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধির পরেও বলবৎ থাকে। সন্তান উৎপাদনের সঙ্গে বিবাহ বন্ধন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বস্তুত বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। নর নারীর সঙ্গ এবং নারী নরের সঙ্গ কামনা করে এবং পরস্পরের সংস্পর্শ পেতে চায়। নর ও নারীর এই পারস্পরিক আকর্ষণের পরিণতি যৌনমিলন। যৌনমিলনের আকাঙ্খা যাতে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও বিভেদের কারণ না হয়, তাই বিবাহের মাধ্যমে মানুষের এই সহজাত প্রবৃত্তিকে একজোড়া নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। বিবাহ ব্যবস্থার ফলে নর ও নারীর যথেচ্ছ যৌনমিলন বাতিল হয়, তবে বিবাহিত এক জোড়া নারী ও পুরুষের অবাধ যৌন মিলন সামাজিক স্বীকৃতি পায়। বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রী সঙ্গোপনে, একান্তে এবং নিভৃতে নিজেরা যৌন মিলনে আনন্দ উপভোগ করে।

যৌন মিলনের আবশ্যম্ভাবী ফল সন্তানের জন্ম। নর ও নারী যেমন পরস্পরকে চায়, তেমনি তারা সন্তানও চায়। স্ত্রী সন্তান চায়, স্বামীও সন্তান চায়। বিবাহোত্তর যৌন মিলনের মাধ্যমে মানুষের সন্তানাকাঙ্খা পরিপূর্ণতা লাভ করে। কাজেই বলা যায় যে, বিবাহ নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বীকৃত যৌন মিলনের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং এই মিলনের পরিণতিতে তাদের সন্তানের আকাঙ্খাকে ফলপ্রসূ করে।

উদাহরণ স্বরূপ আফ্রিকার নুয়ের উপজাতির বিবাহ ব্যবস্থা উল্লেখ করা যায়। নুয়েরদের বিয়ের একটি অত্যাবশ্যক শর্ত সন্তান জন্ম। বস্তুত সন্তানের জন্ম না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে সম্পূর্ণ হয় না। অন্যান্য আদিম

উপজাতির মতো নুয়ের বধূর পিতামাতাকে বধূপণ দিতে হয়। কিন্তু বিয়ের পরে সন্তান না হওয়া পর্যন্ত পিতামাতা এই বধূপণের উপর পরিপূর্ণ অধিকার পান না এবং এই বধূপণ ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ বিবাহিত বধূ যদি সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হয় তাহলে বধূর পিতামাতা বরের পিতামাতাকে বধূপণ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকেন।

বিয়ের পরে নুয়ের বধূ মাত্র একদিনের জন্যে পতিগৃহে যায়। পতি গৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে বধূকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে তোলা হয়। বধূ ঘরে প্রবেশের পরে বরের বন্ধুবান্ধবরা বরকে বধূর সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে যৌন মিলনের জন্য ঘরের ভেতরে ঠেলে দেয় এবং বাইরে অপেক্ষা করে। বর বধূর সঙ্গে যৌন সংসর্গ করে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং বন্ধুবান্ধবরা হাস্য কৌতুকের সঙ্গে এই আনুষ্ঠানিক মিলন ঘোষণা করে।

এরপর বধূ পিতৃগৃহে ফিরে যায় এবং বর নিজগৃহে রয়ে যায়। বর ও বধূ নিজ নিজ গৃহে এমনভাবে বাস করে যেন তাদের বিয়ে হয় নি তবে আত্মীয় স্বজনরা আশা করে যে বর গোপনে বধূর সাথে মিলিত হবে। তাই বর মাঝে মাঝে বধূর কোনো পড়শীর বাসায় এসে গোপনে বধূকে সংবাদ দেয়। গভীর রাতে বর বধূর কক্ষে গিয়ে তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং পাখি ডাকার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে প্রস্থান করে। কারণ স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনের সাথে তার দেখা সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ, সে স্ত্রীর গৃহে জল স্পর্শ করতে পারে না। কোনো অবস্থাতেই বর যেন শ্বশুর শাশুড়ীর নজরে না পড়ে সে জন্য সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যাবশ্যক। শ্বাশুর-শাশুড়ী যেন জানতে না পারেন যে তাদের জামাতা কন্যার সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। কাজেই বরকে অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হতে হয়।

সন্তান জন্মের আগ পর্যন্ত এই লুকোচুরি চলে। সন্তান জন্মালে শ্বশুরশাশুড়ী বরকে জামাতারূপে বরণ করেন, বর বধূকে নিজ গৃহে নিয়ে যাবার অধিকার লাভ করে। সন্তান জন্মের পর বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানগুলো সমাধা করা হয় এবং স্ত্রী ও সন্তান সমভিব্যাহারে বর পিতৃগৃহে প্রস্থান করে। এখন থেকে তারা প্রকৃত পক্ষে বিবাহিত গণ্য হয়। কাজেই দেখা

যায় নুয়ের উপজাতিতে যৌন মিলন ও সন্তান উৎপাদন বিয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দুই ছাড়া বিয়েকে বিয়ে বলে গণ্য করা যায় না।

আমাদের সমাজে বিয়ের পর বাসর ঘরে স্বামী স্ত্রীর রাত্রি যাপনের যে প্রথা প্রচলিত তা প্রকৃতপক্ষে বর বধূর যৌন মিলনের সামাজিক স্বীকৃতি।

তবে ব্যতিক্রম আছে। যৌনমিলনের শর্ত বিহীন বিবাহ বিরল হতে পারে,কিন্তু অসম্ভব নয়। দাহোমী উপজাতিতে ফিরে যাই। সেখানকার মহিলা স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রীদের যৌন মিলনের অবকাশ নেই।

ভারতের নায়ার উপজাতির মধ্যে অদ্ভুত বিবাহ ব্যবস্থা দেখা যায়। নায়ার তরুণীর আনুষ্ঠানিক বিয়ে হয়। চারদিন ধরে নানা আচার অনুষ্ঠান পালিত হয়। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। স্ত্রী নিজ গৃহে থেকে যায় এবং স্বামীর আপন গৃহে ফিরে যায়। নায়ার স্ত্রী তার যৌন সংসর্গ স্বামীর মধ্যে সীমিত রাখতে বাধ্য নয়, সে তার পছন্দমতো লোকজনের সাথে যৌন মিলন করতে থাকে, তাতে কারো আপত্তি করার উপায় নেই। সে পর্যায়ক্রমে তথাকথিত "অতিথি স্বামীদের" এক এক জনের সঙ্গে এক একটি রাত কাটায়। যখন কোনো অতিথি স্বামী তার ঘরে যায় তখন সে তার হাতিয়ার দরজায় ঝুলিয়ে রাখে। অন্যান্য অতিথি স্বামীরা এ থেকে বুঝতে পারে যে তাদের একজন এখন তাদের "বাঞ্ছিতার সাহচর্য" উপভোগ করেছে এবং তাদের পরবর্তী রাত্রির জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

নর নারীর সতীত্ব সম্পর্কে অনেক উপজাতি একেবারে উদাসীন। প্রাক বিবাহ যৌন সংসর্গকে তারা আমল দেয় না। এমন উপজাতি আছে যাদের মধ্যে বিয়ের বাজারে অন্তঃসত্ত্বা কুমারীর চাহিদা সাধারণ কুমারীর চেয়ে বেশি। নাইজেরিয়ার কাদার উপজাতিতে বাবা মা তিন থেকে ছয় বছরের ছেলে মেয়েদের মধ্যে বিয়ের বাক দান করেন। বাকদানের দশবছর পরে বাগদত্তা তরুণী স্বামীর সঙ্গে বসবাস শুরু করে। এই দশ বৎসরের মধ্যে প্রায়ই বাগদত্তা তরুণী আন্তঃসত্ত্বা হয় এবং স্বামী গৃহে গমনের পূর্বেই মা হয়ে পড়ে। কিন্তু এই কুমারী মাতৃত্ব তাদের বিয়েতে কোনো প্রতিবন্ধকতা

সৃষ্টি করে না, বরং অন্তঃসত্বা বা প্রসূতি বাগদত্তা সন্তান প্রসবিনী হিসেবে স্বামী গৃহে অধিকতর আদৃত হয়।

যৌন মিলনের প্রসঙ্গ ছেড়ে দিলেও সন্তান উৎপাদনের প্রসঙ্গ থেকে যায়। বিবাহে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যৌন মিলনের বাধ্যবাধকতা না থাকলেও সন্তান উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা প্রায় সব ক্ষেত্রেই স্বীকার করা হয়। দাহোমীর মহিলা স্বামী নিজে স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার করতে পারে না, তবে মনোনীত পুরুষের ঔরসে স্ত্রীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের ব্যবস্থা নেয়। প্রসূত সন্তান মহিলা স্বামীর সন্তান রূপে পরিগণিত হয়, জন্মদাতা সন্তানের উপর কোনো সত্ত লাভ করে না ।

সন্তান উৎপাদনই নায়ার রমণীর বিয়ের উদ্দেশ্য। যদিও বিয়ের পরে একাধিক পুরুষ সংসর্গে সন্তান জন্ম নেয়, কিন্তু তথাকথিত বিয়ের পূর্বে গর্ভবতী হলে নায়ার তরুণী সমাজে ধিকৃত হয়। বস্তুত কেবল সমাজ স্বীকৃত পন্থায় সন্তান লাভের জন্যই নায়ার রমনীর বিয়ে দিতে হয়।

নায়ার বা কাদার উপজাতিতে যে কেউ জন্মদাতা হতে পারে, বিবাহিত স্বামীকেই প্রসূত সন্তানের জন্মদাতা হতে হবে — এমন বাধ্যবাধকতা নেই। সন্তান উৎপাদনে যদি বিবাহিত স্বামীর ভূমিকা না থাকে, তবে বিবাহের প্রয়োজন রইল কোথায়?

একদল নৃবিজ্ঞানীর মতে যৌন মিলন বা সন্তান উৎপাদন নয়, সমাজের সদস্য হিসেবে সন্তানের অধিকার প্রতিষ্ঠাই বিবাহের উদ্দেশ্য। এই প্রেক্ষিতে ক্যাথলিন গাফ বিবাহের ভিন্নতর সংজ্ঞা দিয়েছেন, তার মতে বিবাহ একটি রমণী এবং এক বা একাধিক ব্যক্তির (নারী বা পরুষ) মধ্যে এমন সম্বন্ধ যার ফলে ঐ রমণীর গর্ভজাত সন্তান সমাজের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে সমঅধিকার ভোগ করে।

এই সংজ্ঞায় বিয়েকে নারী ও পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি এবং যৌন মিলন ও সন্তান উৎপাদনকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নি। গাফ এর সংজ্ঞার মূল কথা এই যে বিয়ে প্রসূত সন্তানের অধিকার নিশ্চিত করে।

সকল সমাজেই সমাজের সদস্যরা কতিপয় অধিকার ভোগ করে, সমাজের সদস্য গণ্য না হলে কেউ এই অধিকার লাভ করতে পারে না । কাজেই কে সমাজের সদস্য, কে নয়, তা সুনির্দিষ্ট হওয়া প্রয়োজন। বিবাহের মাধ্যমে সদস্যপদ লাভ সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। বিবাহ বন্ধনের আওতায় জন্ম প্রাপ্ত সন্তান এই সদস্যপদ লাভ করে।

এ প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের প্রশ্ন এসে যায়। সাধারণভাবে সন্তান পিতার উত্তরাধিকার পায়। বিয়ের ফলে কাদার উপজাতির বাগদত্তা কুমারী মাতার সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারিত হয়। সন্তানের জন্মদাতা যেই হোক, বিয়ের পরে বাগদত্তা স্বামীই সন্তানের পিতারূপে চিহ্নিত হয়। ফলে প্রসূত সন্তান পিতার উত্তরাধিকার এবং সেই সঙ্গে পিতার সমাজের সদস্য হিসেবে সকল অধিকার লাভ করে। দাহোমীর মহিলা-স্বামী যদিও সন্তানের জন্মদাতা নয়, কিন্তু তার স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান তার গণ্য হয় এবং সন্তানের সকল অধিকার লাভ করে। নায়ার রমণী দ্বিচারিণী হলেও আনুষ্ঠানিক বিয়ের পর সন্তান প্রসব করলে বিবাহিত স্বামী পিতৃত্ব দান করে, কিন্তু বিয়ের আগে সন্তান হলে পিতৃত্ব দান করার জন্য কেউ থাকে না। ফলে সন্তান অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

কাজেই বলা যায়, বিয়ে সন্তানের পিতৃ নির্দেশ করার একটি পদ্ধতি। নৃবিজ্ঞানী ম্যালেনস্কির ভাষায়, "বিবাহ মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের অনুমোদন।"

আমাদের আলোচনা থেকে মনে হতে পারে যে বিয়ে স্বামী স্ত্রীর ব্যক্তিগত ব্যাপার, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌন মিলন ও সন্তান উৎপাদন। কিন্তু বাস্তবে বিয়েকে এমন সংকুচিত গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা ঠিক নয়। কান টানলে যেমন মাথা আসে, বিয়ের প্রসঙ্গ ধরে টান দিলে পরিবারের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বস্তুত বিয়ের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়ে থাকে। বিয়েতে একজোড়া নারী পুরুষ পরস্পরের সঙ্গোপন সান্নিধ্যে আসে এবং কিছুদিনের মধ্যে আসে বাঞ্ছিত পরিণতি হিসেবে সন্তান। স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে গঠিত হয় পরিবার। এ ধরনের স্বামী স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সম্বলিত পরিবারকে ক্ষুদে বা অনুপরিবার বলা যেতে পারে। আবার

এমন পরিবার আছে যেখানে সদস্য সংখ্যা আরও ব্যাপক। দাদা, দাদী, বাবা, মা এবং ছেলে, মেয়ে এক পরিবারের সদস্য এমন ব্যবস্থার অভাব নেই। এ ধরনের পরিবারকে ব্যাপক পরিবার বলা চলে। তবে উভয় ধরনের পরিবারের মূলে আছে বিবাহ এবং বিবাহিত নারী পুরুষ। অনুপরিবারের স্বামী স্ত্রী যেমন বিবাহিত দম্পতি, তেমনি ব্যাপক পরিবাবের দাদা দাদী প্রকৃতপক্ষে বিবাহিত স্বামী স্ত্রী এবং পিতামাতা ও বিবাহিত দম্পতি। পরিবারের পরিপ্রেক্ষিতে বিয়ের কার্যকলাপ যৌন মিলন ও সন্তান উৎপাদনের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না ; বৃহত্তর পরিমণ্ডলে তার ব্যাপ্তি অপরিহার্য।

কিছু কিছু নৃবিজ্ঞানী বিয়েকে তার ক্রিয়াকর্মের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। একটি প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ জানতে পারলে ঐ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ধারণা গড়ে তোলা যায়। বিয়ে কি কর্ম সাধন করে? বিয়ের কর্মকাণ্ডগুলোকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করে দেখা যাক :

(ক) বিয়ে নারীর সন্তানের আইনগত পিতৃত্ব এবং পুরুষের সন্তানের আইনগত মাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে ।

(খ) বিয়ে স্বামীকে স্ত্রীর যৌন জীবন এবং স্ত্রীকে স্বামীর যৌন জীবনের উপর অধিকার প্রদান করে।

(গ) বিয়ে স্বামীর শ্রম শক্তির উপর স্ত্রীর এবং স্ত্রীর শ্রমশক্তির উপর স্বামীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে।

(ঘ) বিয়ে স্বামীর সম্পত্তির উপর স্ত্রীকে এবং স্ত্রীর সম্পত্তির উপর স্বামীকে কর্তৃত্ব দেয়।

(ঙ) বিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর উপর সন্তানের প্রতিপালন ও সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব অর্পণ করে।

(চ) বিয়ে স্বামী ও স্ত্রীর নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে।

প্রত্যেক বিয়েতেই যে সবগুলো কর্ম সাধিত হবে তা হয়ত নয়। তবে সাধারণভাবে বিয়ে উপরে বর্ণিত কর্মগুলোর বেশিরভাগ সম্পাদন করে থাকে। ক ও খ কর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আগেই করা হয়েছে। গ ও ঘ মূলত অর্থনৈতিক কর্ম। বিয়ের ফলে স্বামী ও স্ত্রীর নিজস্ব আলাদা কিছু থাকে না, সব কিছুই যৌথ হয়ে যায়। দম্পতির একজনের দৈহিক ও বৈষয়িক সম্পদের উপর অপরজনের এখতিয়ার থাকে এবং তা দুজনের সম্মতিক্রমে তারা ভাগাভাগি করে ভোগ করে। উত্তরাধিকার আইনে সাধারণত স্বামী ও স্ত্রীর স্থাবর সম্পত্তিতে পরস্পরের স্বীকৃত অংশ নির্দিষ্ট থাকে। স্বামী ও স্ত্রীর শ্রমশক্তি পারস্পররিক স্বার্থে অর্থাৎ দম্পতির বৃহত্তর যৌথ স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। স্বামী যা আয় উপার্জন করে তা সে একা ভোগ করে না। স্ত্রীর যদি কোনো আয় বা পুঁজি থাকে সে তা একাকী ভোগ করবে, স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ভোগ করবে না — এমন সাধারণত হয় না। এ ছাড়া, স্বামী স্ত্রী নিজের শ্রমশক্তিও ভাগ করে নেয়। দম্পতির মধ্যে শ্রম-বিভাগ গড়ে ওঠে। একজন চিরকুমারকে (যদি সে বিত্তবান না হয়) ঘর ঝাট দেওয়া রান্নাবান্না করা থেকে অফিসে বা ফ্যাক্টরিতে কাজ অর্থাৎ অর্থ-উপার্জনের কাজ সব একাই করতে হবে। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী কাজ ভাগ করে নেয়, শ্রম বিভাগের সুবিধা এই যে, তাতে শ্রমের সাশ্রয় হয়। শ্রম-বিভাগের ফলে স্বামী স্ত্রী দুজনের বোঝা কমে, জীবন-ধারণে স্বাচ্ছন্দ্য আসে, জীবন-যাপন সহজ হয়।

'ঙ' কর্মটি সন্তান উৎপাদনের প্রত্যক্ষ ফল। যে সন্তানকে স্বামী স্ত্রী পৃথিবীতে এনেছে তাকে প্রতিপালন করা এবং ভালোভাবে বাঁচবার সুযোগ করে দেওয়া জন্মদাতাদের অবশ্য কর্তব্য। ছেলের ভবিষ্যৎ গড়ার কাজে পিতা মাতারই অগ্রণী ভূমিকা থাকতে হবে। এ কাজের ব্যয় ভারও তাদেরই বহন হরতে হবে। পিতামাতার সম্পত্তি এবং শ্রমের একটি অংশ সন্তানের জন্য নির্দিষ্ট হতে হবে যাতে সন্তান মানুষের মতো মানুষ হতে পারে।

যে কাজগুলোর কথা বলা হলো সেগুলোর মধ্যে দেওয়া নেওয়ার বাস্তবতা সুস্পষ্ট। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেওয়া নেওয়া, আদান প্রদানের আদর্শের সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতা ঘটে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্বার্থের একাত্ম, মন ও মতের মিল থাকতে হবে, তাদের মধ্যে থাকতে হবে স্বতঃস্ফূর্ত সমঝোতা। এক কথায় বিয়ের একটি মনস্তাত্বিক দিক আছে। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মনের সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠিত না হলে বর্ণিত কর্মগুলো সুচারু সমাধান অসম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মমত্ববোধ, সহানুভূতি, সহর্মিতা, ও সহনশীলতার পূর্ণ বিকাশ ঘটতে হবে, তবেই বিয়ের উদ্দেশ্য সফল হবে। এই মনস্তাত্বিক দিক বহুধা বিস্তৃত। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পর পরস্পরের মনের খোরাক যোগায়, একজনের নিঃসঙ্গতা অপরে পূরণ করে, একজনের অভাব অন্যজন মেটায়। আপদে বিপদে, আনন্দে বিষাদে, সুখে দুঃখে, রোগে শোকে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের কাছ থেকে সহানুভূতি পায়, একাত্মতা লাভ করে এবং দুঃখ সইবার মনোবল লাভ করে।

সর্বশেষে যে কর্মটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা স্পষ্টতঃই সামাজিক কর্ম। বিয়ের মাধ্যমে দুই দল লোক পরস্পরের নিকটে আসে। বিয়ের পূর্বে বর ও কনে নিজ নিজ সম্পর্কের পরিমণ্ডলে ছিল, এখন এই পরিমণ্ডল একত্র হয়ে সম্পর্কের নতুন ও ব্যাপকতর পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্বন্ধের পরিধি বৃদ্ধি পায়, সামাজিক আদান প্রদানের পরিসর পরিব্যাপ্ত হয়।

তবে অন্য যে কর্মগুলোর কথা বলা হলো সেগুলোও সমাজের সঙ্গে সম্পর্কহীন নয়। সবগুলো কর্মেরই সামাজিক দিক আছে। বিয়ের সব চেয়ে ব্যক্তিগত অঙ্গ যৌন মিলন ও সন্তান উৎপাদন। কিন্তু বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে দেখলে সন্তান উৎপাদনকে কি স্বামী ও স্ত্রীর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়া যায়? সকল সন্তান ভবিষ্যতের নাগরিক। জন্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে সে কতকগুলো অধিকার ও সুযোগসুবিধার দাবিদার হয়ে পড়ে। পিতামাতা যদি সন্তানকে মানুষ করতে না পারেন, তাদের আর্থিক সঙ্গতি যদি সন্তানদের প্রতিপালনে অনুকূল না হয় তাহলে

সন্তান রাষ্ট্র ও সমাজের সকল সুযোগ ভোগ করবে এবং সমাজের সম্পদে ভাগ বসাবে, কিন্তু বিনিময়ে সমাজকে যতটা দেওয়া উচিত তা দিতে পারবে না। ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ঐ সন্তান সমাজের জন্য অহেতুক ভার হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলাদেশের প্রসঙ্গে আসি। আমরা জনসংখ্যা সমস্যায় ভুগছি। দেশের লোকসংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় অধিক এবং জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সন্তান উৎপাদন দম্পতির অনিয়ন্ত্রিত ও যথেচ্ছ ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দেওয়ার ফলেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে সন্তান উৎপাদন কি স্বামী স্ত্রীর ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে? এ প্রশ্নের জবাব সম্পর্কে আজ আর দ্বিমত নেই। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা আজ রাষ্ট্রীয় নীতি। দম্পতির সন্তান সংখ্যা দুইয়ে সীমাবদ্ধ রেখে সন্তান উৎপাদন নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সমাজ তথা রাষ্ট্র বিভিন্ন ব্যবস্থা ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিয়ের যৌন মিলন ও সন্তান উৎপাদন কর্মকাণ্ড আমাদের দেশে দম্পতির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক সিদ্ধান্তের ব্যাপার হয়ে পড়েছে।

আমাদের আলোচনা থেকে একথা স্পষ্ট যে বিয়ের ব্যাপারটি জটিল। বিয়েতে যেমন আছে আনন্দ তেমনি আছে দায়িত্ব, দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে আছে বিষাদ। বিয়ের আনন্দ, দায়িত্ব, ও বিষাদ, কোনো একজন ব্যক্তি বা একজোড়া স্বামী স্ত্রী বা পিতামাতা সন্তানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এ আনন্দ, বিষাদ ও দায়িত্ব ব্যক্তি, দম্পতি ও পরিবারের গণ্ডি পেরিয়ে সমাজ রাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ পরিসরে বিস্তৃত। আমাদের সমাজে প্রচলিত প্রবাদে বিয়েকে যে দিল্লির লাড়্ডুর সঙ্গে তুলনা করা হয় তা তৎপর্যহীন নয়, এই লাড্ডু যে খায় সেও পস্তায়, যে না খায় সেও পস্তায়। না খেয়ে পস্তানোর চেয়ে খেয়ে পস্তানো অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। তাই সকল সাধারণ নারী পুরুষ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিয়ের উৎপত্তি

আধুনিক সভ্য বিশ্বে এক পত্নীর একাধিক পতির সঙ্গে বিয়ে হয় না । কোনো কোনো সমাজে একপতি একাধিক পত্নী বিয়ে করতে পারে বটে, তবে তা সুনজরে দেখা হয় না। একপতি ও এক পত্নীর বিয়েই এখন সর্বোত্তম ও রুচিশীল ব্যবস্থা হিসেবে জগতে আদৃত। একপতির সঙ্গে এক পত্নীর বিয়ে ব্যবস্থাকে বলে একক বিবাহ বা একগামিতা। সভ্য দুনিয়ার অধিকাংশ নর ও নারী এখন একগামী।

কিন্তু মানুষ চিরদিন সভ্য ছিল না। হাজার হাজার বছর পৃথিবীর মানুষ গাছের ফলমূল ও শিকারের কাঁচামাংস খেয়ে কাটিয়েছে। এমন একযুগ ছিল যখন তারা আগুনের ব্যবহার জানত না এবং জমি চষে ফসল ফলানো সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। সুদূর অতীতের সেই শিকারির ও ফলমূল আহরণকারী মানুষের মধ্যে কি বিয়ের প্রচলন ছিল? পৃথিবীর প্রথম বিবাহ কি একক বিবাহ ছিল?

এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব কেউ জানেনা। নৃবিজ্ঞানীরা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়েছেন, পৃথিবীর আনাচে কানাচে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত উপজাতিদের মধ্যে বিচরণ করেছেন। কিন্তু বিয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁরা সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌছতে পারেন নি। নৃবিজ্ঞানীদের মধ্যে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত প্রচলিত আছে। একদল বলেছেন যে, মানুষ যেমন কাঁচা মাংস আহারণকারী অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে আধুনিক সভ্য ও উন্নত অবস্থায় উপনীত হয়েছে, বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটিও একইভাবে বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়

আজকের রূপ লাভ করেছে। তাদের মতে মানব জাতি সুদীর্ঘ যাত্রাপথে এমন একটি পর্যায় ছিল যখন বিয়ে বলে কিছু ছিল না, স্বামী বা স্ত্রী বলে কোনো সম্পর্ক বা সম্বন্ধ ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে ধীরে ধীরে নারী পুরুষের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্কের সূচনা হয় এবং পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কালক্রমে মানুষ এক স্বামী ও এক স্ত্রীর মধ্যে একগামী বিবাহ ব্যবস্থায় এসে পৌঁছে।

সকল নৃবিজ্ঞানী এই বিবর্তনের প্রক্রিয়াকে স্বীকার করেন নি। কেউ কেউ দাবি করেছেন যে স্বামী ও স্ত্রী হিসেবেই মানুষের জীবন শুরু হয়েছিল, এবং প্রথম দম্পত্তি ছিল একগামী।

যারা বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী তাদের দিয়ে শুরু করি। এদের মধ্যে নানা জন নানাভাবে প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করেছেন। তবে তাদের এক বিষয়ে কোনো মত পার্থক্য নেই — বিবর্তনের এক পর্যায়ে মানুষ বিয়ে কি তা জানত না, নারী পুরুষ আবধে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারত। যৌন মিলনে বয়স, সম্পর্ক বা মর্যাদার কোনো বাছবিচার ছিল না । যে কোনো নারী যে কোনো পুরুষের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করতে পারত। মা ও ছেলে, বাবা ও মেয়ে, ভাই ও বোন এই আজ চারী যৌন মিলনের আওতার বাইরে ছিল না। প্রত্যেক পুরুষ ছিল প্রত্যেক নারীর জন্য এবং প্রত্যেক নারী ছিল প্রত্যেক পুরুষের জন্য। হিন্দুদের মহাকাব্য মহাভারতে উদ্দালক ঋষির পুত্র শ্বেত কেতু একদিন দেখলেন যে, তার পিতার সামনেই এক ব্রাহ্মণ তার মায়ের হাত ধরে নিয়ে গেল। উদ্দালক পুত্রকে বললেন, 'সনাতন ধর্মই এই, পৃথিবীতে সকল স্ত্রীলোকই গরুর মতো স্বাধীন।' কিভাবে এই অরাজক পরিস্থিতির অবসান ঘটেছিল সে সম্পর্কে মতপার্থক্য আছে।

শিকারি ও ফলমূল আহরণকারী যাযাবর মানুষ নিরাপত্তার জন্য দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াত। খাদ্যের উৎস নিয়ে বিভিন্ন দলের মধ্যে যুদ্ধ ও বিবাদ লেগে থাকত। এ সকল সংঘাতে মেয়েরা কাজে আসত না, বরং যুদ্ধ বিগ্রহে মেয়েরা ছিল গলগ্রহ। তাই আদিম দলগুলোর মধ্যে নারী শিশু

হত্যার প্রথা প্রচলিত হয়। পুরুষ শিশুকে বাঁচিয়ে রেখে নারী–শিশু হত্যার অবশ্যম্ভাবী ফল পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা হ্রাস। দলের মধ্যে নারীর অভাব ঘটলে, অবাধ যৌন মিলন অসুবিধাজনক হয়ে পড়ল। কারণ প্রত্যেক পুরুষের পক্ষে প্রয়োজনে নারীর সংসর্গ লাভ কঠিন হয়ে উঠলো। তখন দলের সদস্যরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ হয়ে এক এক দল পুরুষ একজন নির্দিষ্ট মহিলার সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল। এভাবে একজন নারীর সঙ্গে একাধিক পুরুষের যৌন সম্পর্ক গড়ে উঠল। কালক্রমে এক মায়ের গর্ভজাত সকল সন্তান একজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হলো। অবস্থাটা দাঁড়ালো এক পত্নীর একাধিক পতি অর্থাৎ বহুপতিত্ব ব্যবস্থার মতো।

বাছবিচারহীন নারী পুরুষের মিলন থেকে সরাসরি বহুপতিত্ব ব্যবস্থায় বিবর্তন প্রক্রিয়াটি সবার স্বীকৃতি পায় নি। কেউ কেউ বিবর্তন প্রক্রিয়ায় আরও অনেকগুলো পথ নির্দেশ করেছেন। তাদের মতে অরাজক নারী পুরুষ সম্পর্ক থেকে মানবজাতির প্রথম উত্তরণ ঘটে এমন একটি ব্যবস্থায় যেখানে পিতা ও কন্যা এবং মাতা ও পুত্রের মধ্যে যৌন মিলন নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু ভাইবোনের মধ্যে সংসর্গ অব্যাহত থাকে।

দলভুক্ত যে কোনো মায়ের গর্ভজাত সকল পুত্র ও কন্যা পরস্পরের সঙ্গে কেবলমাত্র সহোদরের সম্পর্কেই আবদ্ধ নয়, তারা পরস্পরের সঙ্গে যৌন সম্পর্কেও আবদ্ধ। সকল সহোদর ভাই যৌথভাবে সকল সহোদর বোনের স্বামী এবং সহোদর বোন যৌথভাবে সকল সহোদর ভাইয়ের স্ত্রী। জন্ম সূত্রে একজন ভাই সকল সহোদরার সঙ্গে যৌন মিলনের অধিকার লাভ করে এবং একজন বোন সকল সহোদরের সঙ্গে যৌন সংসর্গের অধিকার পায়। কিন্তু পিতা ও কন্যা এবং মাতা ও পুত্রের মধ্যে এধরনের সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়।

ভাইবোনে যৌথ বিবাহ ব্যবস্থা টেকে নি। বিবর্তনের প্রথম ধাপে দুই ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন পুরুষের মধ্যে অর্থাৎ মাতা পুত্র ও পিতাকন্যার বিবাহ রহিত হয়েছিল। এবার ভাইবোনে বিবাহ বাতিল হলো। ভাইয়েরা আর সহোদর বোনের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না, সহোদরের

কতকগুলো তথ্য তাঁরা উল্লেখ করেছেন যা থেকে বিভিন্ন ধাপ অনুমান করে নেওয়া যায়।

নতুন বিশ্বের হাওয়াই অঞ্চলে কতকগুলো উপজাতিতে অদ্ভুত সব জাতি সম্বোধন প্রচলিত রয়েছে। সেখানে সাধারণত একজন স্বামীর একজন স্ত্রীর থাকে, অর্থাৎ সন্তানের এক পিতা ও এক মাতা। কিন্তু তাদের সন্তান কেবল স্বীকৃত পিতামাতাকেই পিতামাতা সম্বোধন করে না, এ সম্বোধনটি বহু ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে। সন্তান শুধু তার পিতাকে বাবা ডাকে না, পিতার সকল ভাইকে বাবা সম্বোধন করে। একইভাবে সে মায়ের সকল বোনকেই মা ডাকে। সকল চাচাই সন্তানের বাবা এবং সকল খালা সন্তানের মা। এক কথায় সকল ভায়ের সন্তান এবং সকল বোনের সন্তান পরস্পরের ভাই ও বোন। অপরপক্ষে বাবা ও চাচা নিজ নিজ ঔরসজাত সন্তানকেই কেবল পুত্র বা কন্যা মনে করে না, বাবা তার সকল ভাইয়ের সন্তানকে নিজের পুত্র বা কন্যা মনে করে। অপরপক্ষে মা ও খালা নিজ নিজ গর্ভজাত সন্তানকেই পুত্র বা কন্যা ধরে না, মা তার সকল বোনের সন্তানকেও নিজের পুত্র বা কন্যা বিবেচনা করে। এক কথায় সকল ভাই ও বোন তাদের সকল সন্তানের বাবা ও মা এবং তাদের সকল সন্তান পরস্পর ভাই ও বোন।

একক বিবাহ প্রথায় সন্তান ও পিতা মাতা সন্তানের পিতৃত্ব ও মাতৃত্ব সুনির্দিষ্ট ভাবে জানতে পারে, এ অবস্থায় শুধু বাবা ও মার সঙ্গে পিতা ও মাতার সম্পর্ক সীমাবদ্ধ না রেখে সকল চাচা ও খালার মধ্যে এ সম্পর্ক ছড়িয়ে দেবার কারণ কি? নৃবিজ্ঞানীরা বলেন, এ সম্বোধন ব্যবস্থা অতীতের প্রচলিত ভাই-বোনের যৌথ বিবাহ ব্যবস্থার ধ্বংসাবশেষ। বিবর্তনের একধাপে ভাইবোনে যৌথ বিবাহ ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় পিতৃত্ব সুনির্দিষ্ট ছিল না, তখন সন্তান তার পিতা ও চাচাদের বাবা এবং মা ও খালাদের মা বলতে বাধ্য ছিল। বাবা ও চাচারা এবং মা ও খালারাও তাদের সকল সন্তানকে পুত্র ও কন্যা গণ্য করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। সব ভাই বোনের স্বামী, সব সন্তান ছিল সব ভাই ছিল ও বোনের সন্তান।

কালক্রমে বিবর্তনের নিয়মে যৌথ বিবাহ ব্যবস্থা রহিত হয়েছে, কিন্তু যৌথ সম্বোধন প্রথার রেশ রয়ে গেছে। প্রথা বদলে গেলেই সব আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম বদলে যায় না, নতুনের মধ্যে পুরাতন নিহিত থেকে যায়।

ভাইবোন যৌথ বিয়ে থেকে পরবর্তী পর্যায়ে পৌছার প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায় অন্য কতকগুলো উপজাতির সম্বোধন ব্যবস্থায়। আমেরিকার ইরাকোয়া গোত্রের কথা ধরা যাক। সেখানেও একক বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। কিন্তু সম্বোধন ব্যবস্থা জন্মদাতা পিতা ও গর্ভধারিণী মাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, আবার ঐ সম্পর্কের ব্যাপ্তি বাবা চাচা ও মা খালা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে নেই। ইরাকোয়া পিতা কেবল নিজের ঔরসজাত সন্তানকে পুত্র বা কন্যা জ্ঞান করে না ; তার সকল ভাইয়ের ও সন্তানকেও সমভাবে পুত্র বা কন্যা বলে পরিচয় দেয়। তার সন্তানও অনুরূপভাবে তাকে এবং তার ভাইদের বাবা ডাকে। কিন্তু সে তার বোনের সন্তানকে বলে ভাগ্নে ভাগ্নী, এবং বোনের সন্তানরা তাকে ডাকে মামা। অপরপক্ষে ইরাকোয়া মাতার গর্ভের সন্তানই কেবল তার পুত্র কন্যা নয় ; তার সকল বোনের সন্তানও তার পুত্র কন্যা। কিন্তু তার ভাইয়ের সন্তানরা তার পুত্র কন্যা নয়, তারা তার ভাগ্নে ভাগ্নী। মোটামুটি সম্পর্কটা এই ভাইয়ের সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন, আবার বোনের সন্তানরা পরস্পরের ভাইবোন। কিন্তু মায়ের সন্তান ও মায়ের ভায়ের সন্তানরা পরস্পর সম্পর্কীয় ভাইবোন অর্থৎ 'কাজিন' এবং পিতার সন্তান ও পিতার বোনের সন্তানরা পরস্পর সম্পর্কীয় ভাইবোন অর্থাৎ 'কাজিন'। এখানে হাওয়াই উপজাতির সঙ্গে ইরাকোয়া উপজাতির সম্বোধনের মধ্যে প্রভেদ দেখা দিয়েছে। হাওয়াই উপজাতিতে ভাই ও বোনের সন্তানরা পরস্পরের ভাই ও বোন। কিন্তু ইরাকোয়া উপজাতিতে ভাই ও বোনের সন্তানরা পরস্পরে 'কাজিন'। এর কারণ ইরোকোয়া উপজাতি বিবর্তনের এক ধাপ উপরে উঠে এসেছে, এদের মধ্যে ভাইবোনে যৌথ বিবাহ রহিত হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ধরনের সম্বোধন ব্যবস্থাও রহিত হয়ে গেছে। পরবর্তী ধাপে ইরাকোয়া যৌথ বিবাহ ব্যবস্থা কেবল ভাইদের মধ্যে সীমিত হয়েছে ; ভাইরা

একযোগে বিয়ে করে, কিন্তু বোনদের নয়। অনুরূপভাবে বোনরা যৌথভাবে ভাই নয় এমন পুরুষদের এজমালি স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে। ইরাকোয়া গোত্র অবশ্য এই ধাপে আটকে নেই, কিন্তু এই ধাপের সম্বোধন প্রথা চালু রয়ে গেছে।

এখানে আর একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন। বিয়ের সঙ্গে বংশগতি সরাসরিভাবে যুক্ত। সন্তানের পরিচয় কিভাবে হবে? আমাদের সমাজে পিতার নামে পুত্রের বংশ পরিচয় নির্ধারিত হয়। সন্তান পিতার নামে পরিচিত হয়। চাকুরির দরখাস্তে, স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদন পত্রে, এমনকি বিভিন্ন পরীক্ষায় পাস সার্টিফিকেটে নামের পাশে পিতার নামের উল্লেখ অপরিহার্য।

কিন্তু আদিম উপজাতিতে মাতার নামে সন্তানের পরিচয় হতে দেখা যায়। বস্তুত সন্তানের বংশপরিচয় নির্ধারিত হয় মায়ের দিক থেকে। প্রাচীন মিশরে সন্তানের বংশ গণনা করা হতো মায়ের দিক দিয়ে। মায়ের পরিচয়ে সন্তানের পরিচয় হতো। সন্তানের কুলুজিতে পিতার নাম উল্লেখ করা হতো না। মায়ের কুলুজি সম্বলিত অনেক লিপির পাঠোদ্ধার হয়েছে। সেগুলোতে রাজ রাজরাদের ঊর্ধ্বতন বংশাবলীর বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু সবই মায়ের দিক দিয়ে, পিতার কোনো উল্লেখ সে গুলোতে নেই। মায়ের নামে সন্তানের পরিচয় — এই রীতিকে বলা হয় মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা। প্রতিপক্ষে পিতার নামে বংশ ধারা নির্ধারণ ব্যবস্থাকে বলা হয় পিতৃসূত্রীয়। বর্তমান যুগে পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থাই ব্যাপকভাবে প্রচলিত, কিন্তু তাই বলে মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা লোপ পায় নি। অনেক সমাজে আজও এ-ব্যবস্থা টিকে আছে। আমাদের দেশে বসবাসকারী গারো উপজাতির মধ্যেও এখনও মাতৃসূত্রীয় ব্যবস্থা প্রচলিত।

আদিম সমাজে মাতৃসূত্রীয় বংশাবলীর কারণ কি? পিতার পরিচয়ে পুত্রের পরিচয় দিতে হলে সন্তানের পিতৃত্ব সুনির্দিষ্ট হতে হবে। কিন্তু অবাধ যৌন সম্পর্ক, যৌথ বিবাহ ব্যবস্থা, এমনকি জোড় বাঁধা ব্যবস্থায় এক স্ত্রীর সঙ্গে এককালে একাধিক স্বামীর যৌন সংসর্গ হয়। এমন ক্ষেত্রে

সন্তান কোনো পুরুষের ঔরসজাত তা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। মা যেহেতু সন্তানকে গর্ভে ধারণ করেন, মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক অর্থাৎ সন্তানের মাতৃত্ব সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়। পিতার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয়। কাজেই যে নারী এককালে একাধিক পুরুষের অংকশায়িনী হয় তার সন্তানের পরিচয় কোনো পুরুষের নামে হতে পারে না। তার পরিচয় দিতে হলে মায়ের নাম ছাড়া গত্যন্তর নেই। আদিম সমাজে যে মাতৃসূত্রীয় বংশ ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল তা এই নির্দেশ করে যে তৎকালীন বিবাহ ব্যবস্থায় সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণের উপায় ছিল না ; অর্থাৎ এক স্ত্রীর এক স্বামী এ-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না।

এক স্ত্রীর এক স্বামী বিবর্তনের এই ধাপে উত্তরণের সঙ্গে উৎপাদন ব্যবস্থার যোগ আছে কেউ কেউ দাবি করেছেন। পশু শিকারি ও ফলমূল আহরণকারী মানুষ ছিল যাযাবর। পরুষ বনে-জঙ্গলে পশু শিকার করত, মেয়েরা ফলমূল আহরণ করত। দিনের শেষে সংগৃহীত খাদ্য সবাই ভাগাভাগি করে খেত। নারী ও পুরুষ সবাই কাজ করত, সবাই ভাগ পেত। বড় ছোট ভেদ ছিল না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা ব্যক্তি মালিকানার স্থান ছিল না।

পশু পালন এবং পরে কৃষিকাজ আবিষ্কারে মানুষের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আমূল বদলে গেল। জমিত চাষ হয়, ফসল ভালো হলে ফসল উদ্বৃত্ত থাকে। কাজেই জমি ও উদ্বৃত্ত ফসলের মালিকানার প্রশ্ন দেখা দিল।

মেয়েরা কৃষি কাজ আবিষ্কার করেছিল, কিন্তু কৃষির উপর কতৃত্ব রাখতে পারে নি। ঘটনাচক্রে পুরুষ এই কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নেয়। পুরুষ জমি চষে ফসল ফলায় ; নারী গৃহ কর্ম করে। পুরুষ যেহেতু ফসল ফলায়, জমি ও ফসলের মালিক হয় পুরুষ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি পুরুষের সম্পত্তির সমার্থক হয়ে পড়ে। নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক ক্ষমতা উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল ছিল। পুরুষ উৎপাদন করে, সেই কর্তা। নারী কৃষি উৎপাদনে অংশ নেয় না, উৎপাদনে তার প্রত্যক্ষ ভূমিকা নেই ; ফলে সে পুরুষের পেছনে পড়ে যায়।

ব্যক্তি মালিকানার প্রসঙ্গে উত্তরাধিকারের প্রসঙ্গ ওঠে। পুরুষের মৃত্যুর পরে এই সম্পত্তি কে পাবে? মায়ের পরিচয়ে যে সন্তানের পরিচয়, সে, না পিতার পরিচয়ে যে সন্তানের পরিচয়, সে? সম্পত্তির মালিক পুরুষ স্বভাবতই চাইবে যে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হোক সে, যে তার নামে পরিচয় দিতে পারবে। তার জমি এবং সে নিজে যেন সন্তানের পরিচয়ের মাধ্যমে বেঁচে থাকতে পারে, এ বাসনা পুরুষের মনে সহজাতভাবে দেখা দিল। কিন্তু যৌথ বিবাহ কিংবা জোড় বাঁধা-ব্যবস্থায় পিতৃপরিচয় অনিশ্চিত। পিতৃত্ব তখনই সুনির্দিষ্ট হতে পারে যখন নারী একজন পুরুষের সম্পূর্ণ অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয় এবং কেবল একজন পুরুষের সঙ্গে তার যৌন সম্পর্ক সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। পুরুষ যদি একজন নারীর দণ্ডমুন্ডেরকর্তা হয়, তবে সে ঐ নারীর গর্ভজাত সন্তানের পিতা হিসেবে নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে। কাজেই সম্পত্তির মালিকানা ও উত্তরাধিকারের স্বার্থে একজন স্ত্রীর একটি স্বামী থাকা অত্যাবশ্যক। তবে একজন স্বামীর একটি স্ত্রী থাকা কিন্তু জরুরি নয়। স্বামী যদি একাধিক স্ত্রীর একমাত্র স্বামী হয় এবং ঐ স্ত্রীরা যদি একমাত্র তার সঙ্গেই যৌন সংসর্গ করতে বাধ্য হয় তবে ঐ স্ত্রীদের গর্ভজাত সকল সন্তানই ঐ একক স্বামীর ঔরসজাত সন্তান হবে এবং স্বামী সবগুলো সন্তানকে নিজের সন্তান বলে নিশ্চিত দাবি করতে পারবে। এভাবে যে নতুন ব্যবস্থা সৃষ্টি হলো তা এই এক স্ত্রীর একাধিক স্বামী নিষিদ্ধ হলো, এক স্বামীর এক বা একাধিক স্ত্রী বাবস্থা প্রবর্তিত হলো। শুধু সন্তানের পিতৃত্বই যথেষ্ট নয় ; সন্তানকে যোগ্য উত্তরাধিকার হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। আগে সন্তান থাকত মায়ের কাছে ; মা তাকে নিজ সন্তান হিসেবে মানুষ করতেন। কিন্তু সন্তান এখন মানুষ হবে পিতার সন্তান হিসেবে। মা সন্তানকে মানুষ করবেন স্বামীর সন্তানরূপে, স্বামীর উত্তরাধিকাররূপে। কাজেই মার উপর সন্তানের লালন পালনের ভার পড়লেও সন্তান প্রতিপালিত হবে স্বামীর নির্দেশে, স্বামীর স্বার্থে, স্বামীর কর্তৃত্বে। পিতৃত্ব ও সন্তানের লালন পালনের জন্য বিয়েকে একটি দীর্ঘস্থায়ী সমাজ স্বীকৃত ব্যবস্থা হিসেবে

অনুমোদন করা প্রয়োজন। কাজেই বহু পত্নীত্ব সমাজ অনুমোদিত একটি দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার রূপ নিলো। এ ব্যবস্থাকে স্থায়ী ও আইনগত মর্যাদা দানের জন্য নানা আচার অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হলো।

বিবাহে পুরুষের কর্তৃত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে দায়িত্ব বৃদ্ধি পেল। এখন স্ত্রী ও সন্তানের ভরণ পোষণ স্বামীর একক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনের সঙ্গতি থাকলেই বহু পত্নী গ্রহণ করা সম্ভব। নতুন উৎপাদন ব্যবস্থায় যারা জমির মালিকানা হস্তগত করেছিল তারাই হলো সম্পত্তির মালিক, সম্পত্তির মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে মাতব্বরিত তাদের হাতে এসে গেল। তারা হলো ধনী বিত্তশালী সমাজপতি। তাদের পক্ষে একাধিক স্ত্রী গ্রহণ মোটেই সমস্যা ছিল না। বরং একাধিক স্ত্রী মানে অধিক সন্তান ; অধিক সন্তান মানে কৃষিকাজের জন্য বাড়তি লোকবল এবং তার ফলে অধিক ফসল। তাই সকল আদিম সমাজে দলপতিদের অগুনতি স্ত্রী দেখা যায়।

কিন্তু আদিম সমাজে আমলোকের অবস্থা কখনও ভালো ছিল না ; তাদের কষ্টে সৃষ্টে দিন গুজরান করতে হতো। তাই একাধিক স্ত্রীর ভার গ্রহণের সঙ্গতি খুব কম লোকেরই ছিল এবং সাধারণ লোককে এক স্ত্রীতেই সন্তুষ্ট থাকতে হতো। ফলে ব্যবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছিলো যাদের সঙ্গতি ছিল তাদের জন্য বহুপত্নীত্ব, যাদের সঙ্গতি ছিল না, তাদের জন্য একগামিতা। শেষোক্ত শ্রেণীর লোক ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। তবে এদের মধ্যে কেউ হঠাৎ সঙ্গতিপন্ন হয়ে ওঠে তবে একাধিক স্ত্রী বিবাহ করতে পরাঙ্মুখ হয় না। তাই আদিম উপজাতিতে বহুপত্নীত্ব ও একগামিতা পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায়। আধুনিক সভ্য জগতে নারীর মর্যাদা ও সামাজিক ভূমিকা ধীরে ধীরে উন্নত ও অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্যে এবং কিছু কিছু প্রাচ্য দেশেও এখন বহুপত্নীত্ব নিষিদ্ধ এবং একাধিক পত্নীগ্রহণ আইনত দণ্ডনীয়। পৃথিবীর অধিকাংশ পুরুষই আজ একগামী। বিবর্তন প্রক্রিয়া গ্রহণ করলে একগামিতাকে বিবাহের শেষ পরিণতি বলা যায় না। বিবর্তন প্রক্রিয়ায় একগামী ব্যবস্থারও পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। আইগত নতুন বিয়ের ব্যবস্থা কেমন হবে তা বলা মুশকিল।

কেউ কেউ এ সম্পর্কে মতামত রেখেছেন। তাদের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বহুপত্নীত্ব ব্যবস্থার কারণ। যদিও কোনো দেশে আইন করে একগামী ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে ; তবে নারী এখনও পুরুষের অধীন ও অধস্তন। আধুনিক একগামী বিবাহে ও নারীর অধীনতা ও অধস্তন অবস্থা সুস্পষ্ট। একগামী বিবাহের আচার অনুষ্ঠানে স্বামী ও স্ত্রীকে সমান বলে স্বীকার করা হয় না ; বিবাহের শর্তাবলীতে বরং নারী ও পুরুষের সামাজিক প্রভেদ বেশ প্রকট। ব্যক্তিগত সম্পত্তি চালু থাকলে নারী ও পুরুষের ভেদাভেদ থাকবে এবং নারী পুরুষের অধীনতাপাশে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য হবে। বিবাহ ব্যবস্থা বহুপত্নীত্ব হোক বা একগামী হোক, বর্তমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারীর অধীনতাপাশ ছিন্ন হতে পারে না।

তবে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানারও পতন হবে ; তার স্থান দখল করবে রাষ্ট্রীয় মালিকানা। তখন নারী পুরুষে ভেদাভেদ নির্মূল হবে এবং স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। পরিবর্তিত ব্যবস্থায় বিবাহের ভিত্তি হবে স্বামী স্ত্রীর সমান অধিকার, সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও পরস্পরে প্রীতি ও ভালোবাসা। একজন নারী তখন একজন পুরুষের সঙ্গে প্রেম ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হবে, কেউ কারও অধীন হবে না ; দুজনের সম্মলিত ইচ্ছাই হবে বিয়ের ভিত্তি।

একগামী বিয়ের স্বর্ণযুগ কবে আসবে জানিনা, তবে কতিপয় নৃবিজ্ঞানীর মত অনাদিকাল থেকে মানুষ একগামী। মানবজাতির ইতিহাসে বিবাহহীন যৌন সম্পর্ক কখনও ছিল না ; নরনারীর সকল যৌন মিলনই সকল দেশে এবং সকল যুগে বিবাহ বন্ধনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। একগামী হিসেবে মানুষের যাত্রা শুরু হয়েছিলো। তবে বিভিন্ন সময়ে বহুপত্নীত্ব দেখা দিলেও মানুষ প্রধানত একগামী।

আগেই বলেছি নৃবিজ্ঞানীরা এমন কোনো মানব গোষ্ঠীর সন্ধান পান নি যারা কখনও বাছবিচারহীন যৌন সম্পর্কে আসক্ত বলে প্রমাণ আছে। এমন অনেক উপজাতি আছে যারা এখনও বিবর্তনের শিকারি ও ফলমূল আহরণকারী পর্যায়ে আটকে রয়েছে ; কিন্তু তারাও প্রধানত একগামী।

যদিও প্রাচীন অনেক উপজাতিতে এবং অনেক আধুনিক সমাজে বহুপত্নীত্ব দেখা যায়, তবে এমন উপজাতিও আছে যাদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব অজ্ঞাত, এমনকি নিষিদ্ধ। যেখানে বহুপত্নীত্ব আছে সেখানেও দেখা যায় যে প্রথমা স্ত্রীকে সকলের উপরে স্থান দেওয়া হয় এবং স্বামীর একাধিক পত্নী থাকলেও সে একজন বিশেষ পত্নীকেই বেশি পছন্দ করে এবং তার সঙ্গে বেশি সময় কাটায়। যেখানে বহুপতিত্ব আছে সেখানেও একজন স্বামীকে স্ত্রী প্রধান স্বামী হিসেবে দেখে থাকে। মোট কথা, বহুপতিত্ব এবং বহুপত্নীত্ব ব্যতিক্রম ঘটনা এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে এ ব্যবস্থা দেখা যায়। যেমন, কোনো কোনো সমাজে পুরুষের সংখ্যা নারীর চেয়ে বেশ বেশি, আবার কোনো কোনো সমাজের নারীর সংখ্যা পুরুষকে ছাড়িয়ে যায়, কখনও কখনও স্ত্রী সন্তান ধারণে অসমর্থ হয়। এ ধরনের নানাবিধ কারণে বহুপতিত্ব বা বহুপত্নীত্ব দেখা দিতে পারে। কিন্তু এসব ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তকে বিয়ের বিবর্তনের এক একটি ধাপ গণ্য করা ঠিক নয়। আমাদের আদি পুরুষ একগামী ছিলেন — এ সত্য গ্রহণ করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

ইরাকোয়া ও হাওয়াই উপজাতির বিভিন্ন সম্বোধনের প্রচলিত প্রথার বরাত দিয়ে আদিম মানুষের মধ্যে যৌথ বিবাহ অনুমোদন করাকে কেউ কেউ একদেশদর্শী আখ্যায়িত করেছেন। আদিম মানুষের মধ্যে নানা প্রথা ও আচার আচারণ প্রচলিত আছে। বস্তুত আদিম মানুষের বৈশিষ্ট্য, প্রথা ও আচারের বাহুল্য। এসব প্রথা ও আচারের উদ্দেশ্য এবং এগুলোর উদ্ভবের কারণ অনেক ক্ষেত্রেই অস্পষ্ট। এমন অনেক প্রথা আছে যে গুলোর উৎস, কারণ বা ব্যাখ্যা নৃবিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি। অপরপক্ষে এমন অনেক প্রথা আছে যার একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব ; একাধিক কারণ অসঙ্গত নয়। কাজেই কেবল একটি প্রথা দিয়ে বিবাহের যৌথ ব্যবস্থা প্রমাণ হয় না।

আদিম সমাজে বিভিন্ন ধরনের সম্বোধনের বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। বয়স ও নারী–পুরুষ ভেদে সম্বোধন বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং কিছু কিছু সম্বোধন নিছক সামাজিকতা হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

বয়সে ছোট বড় হলে সম্বোধনের হেরফের হয়। অনেক উপজাতিতে বাবার সকল ভাইকে এক নামে ডাকা হয় না ; বাবার বড় ভাইদের জন্য এবং বাবার ছোট ভাইদের জন্য পৃথক পৃথক সম্বোধনের ব্যবস্থা আছে। 'আইনো' উপজাতিতে সন্তানের দাদা-দাদী ও নানা নানীকে সন্তান এবং সন্তানের পিতা উভয়েই দাদা দাদী ও নানা নানী সম্বোধন করে। উরাল আল্টাইকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পিতৃব্যকে এক নামে ডাকা হয়। বড় বোন ও ফুফুর জন্যও অনুরূপভাবে একই সম্বোধন নির্দিষ্ট। এসব ক্ষেত্রে সম্বোধনের ভিত্তি জ্যেষ্ঠতা। যারা বয়সে বড় তাদের সবার জন্য একই সম্বোধন ; তাদের সঙ্গে সম্পর্ক যাই হোক।

অনেক সময় যাকে ডাকা হচ্ছে বা যে ডাকছে সে নারী না পুরুষ তার উপর সম্বোধন শব্দটি নির্ভর করে। পূর্ব মধ্য আফ্রিকায় একজন পুরুষের যদি একভাই ও একবোন থাকে, তাহলে ভাই তাকে যে নামে সম্বোধন করে বোন সে নামে ডাকে না। বোন তাকে অন্য নামে ডাকে, এখানে যে ডাকছে সে নারী না পুরুষ সে অনুসারে সম্বোধন নির্দিষ্ট হয়েছে।

যে ডাকগুলো বলা হলো এগুলো মোটামুটি আত্মীয়স্বজনের মধ্যে সীমিত। তবে আত্মীয়স্বজনের বাইরে বৃহত্তর সামাজিক গণ্ডিতেও নানা প্রকার সম্বোধন প্রচলিত আছে। এগুলো নিছক সামাজিকতা। আদিম সমাজে অনাত্মীয় হলেই তাকে পোষাকী নাম ধরে ডাকা হবে — এটা রীতি নয়, বরং এটা শালীনতা বিরোধী। 'বাসুতো' উপজাতিতে কোনো অনাত্মীয় বয়সে বড় হলে তাকে বাবা বা মা, বয়সে সমান হলে ভাই বা বোন এবং বয়সে ছোট হলে সন্তান বলে সম্বোধন প্রথা প্রচলিত। আমাদের সমাজে ছেলেমেয়েরা গুরুজনের সমবয়সীদের চাচা চাচী বা খালা খালু সম্বোধন করে থাকে। বন্ধুরা পরস্পরের বাবা মাকে চাচা-চাচী বা খালা-খালু ডাকে ; পরস্পরের বড় ভাই বোনদের ভাই বা আপা বলে। গুরুজনদের নাম ধরে ডাকা আমাদের সমাজে গর্হিত বেয়াদবি মনে করা হয়। বন্ধুর স্ত্রীকে ভাবি বলার রেওয়াজ এখন বহুল প্রচলিত। আদিম উপজাতিতেও একই ধরনের প্রথা দেখা যায়। 'হোভা' উপজাতিতে নিজ

গোত্রের কোনো সদস্য যদি আত্মীয় না হয় তবে তাকে ভাই বলাই রেওয়াজ। কোনো হোভা যদি কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, কিংবা তার সঙ্গে যদি কোনো আগন্তুকের দেখা হয়, তবে তাকে ভাই বলে সম্বোধন করে। আদিম সমাজে কেবল জন্মদাতা বা গর্ভধারিণীর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্বোধন নির্ণীত হয় না। কাজেই হাওয়াইন ও ইরাকোয়া সম্বোধন প্রথা যৌথ বিবাহ ব্যবস্থার ইঙ্গিত বহন করে — এ কথা নিশ্চয় বলা যায় না।

যদি ধরে নিই যে, আদিম সমাজে যৌথ বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় সন্তানের পিতৃত্ব অনিশ্চিত ছিল এবং মায়ের সকল স্বামীকে পিতা সম্বোধন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না, তবু প্রশ্ন থেকে যায়। সন্তানের মাতৃত্ব তো সুনিশ্চিত, তাহলে সন্তান মায়ের বোনকে মা ডাকে কেন? ভাইরা নিজেদের পিতৃত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত নয় বলে সকল ভাইয়ের সন্তানকে পুত্র কন্যা জ্ঞান হয়ত করতে পারে। কিন্তু মা তো নিজ নিজ সন্তানদের মাতৃত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত, তারা কেন বোনের সন্তানকে নিজের ছেলেমেয়ে সম্বোধন করবে?

অপরদিকে মাতৃসূত্রীয় প্রথাকে যৌথ বিবাহের প্রমাণ গণ্য করার বিপদ আছে। আমরা যে 'নায়ার' উপজাতির কথা বলেছি, সেখানে স্ত্রী বহু পুরুষ-সঙ্গ করে বলে সন্তানের পিতৃত্ব অনিশ্চিত, কাজেই নায়ার সমাজে মাতৃসূত্রীয় প্রথাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই সমাজে পিতৃসূত্রীয় ব্যবস্থাও দেখা যায়। নায়ার স্ত্রীর পুত্রের পিতৃত্ব অনিশ্চিত হলেও স্বামী ঐ পুত্রকে নিজের পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে এবং পুত্র তার মায়ের স্বামীর উত্তরাধিকার গণ্য হয়। বস্তুত আদিম সমাজে পিতৃত্বের ধারণা আধুনিক সমাজ থেকে ভিন্ন। আমাদের সমাজে কেবল জন্মদাতাকেই পিতা গণ্য করা হয়। স্বামীর ঔরসজাত না হলে সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকৃত হয় না। কিন্তু আদিম সমাজে জৈবিক পিতৃত্ব খুব বেশি আমল পায় না ; অধিকাংশ আদিম সমাজে পিতৃত্বের সামাজিক স্বীকৃতি জৈবিক পিতৃত্বের চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। স্বামী সন্তানের জন্মদাতা হোক না হোক, সামাজিক ভাবে স্বীকৃত পিতৃত্বই

আসল পিতৃত্ব। দাহোমীর মহিলা স্বামীকে তার তথাকথিত স্ত্রীদের গর্ভজাত সন্তানের পিতা হিসেবে সমাজ স্বীকৃতি দেয় এবং ঐ সন্তানরা মহিলা পিতার সন্তান হিসেবে সকল অধিকার ও উত্তরাধিকার লাভ করে। কাদার উপজাতিতে বাগদত্তা স্ত্রী পরপুরুষের ঔরসজাত সন্তান নিয়ে স্বামীর ঘরে এলেও স্বামী ঐ সন্তানের পিতা। নায়ার উপজাতিতে স্বামীকে স্ত্রীর সন্তানের পিতা গণ্য করা হয় যদিও স্বামীর সঙ্গে সন্তানের জন্মগত সম্পর্ক সন্দেহজনক। কিছু কিছু আদিম সমাজে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিয়ে করলে তার অনুজরা নিজেরা বিয়ে করার আগ পর্যন্ত ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে মিলনের অধিকার ভোগ করে। কিন্তু বহুগামী ঐ ভ্রাতৃবধূর সন্তান জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের সন্তান গণ্য হয়। কাজেই আদিম সমাজে জন্মদানের সঙ্গে পিতৃত্বের খুব একটা যোগ নেই। কাজেই যৌথ বিবাহকে মাতৃসূত্রীয় কারণ বলে চিহ্নিত করা খুব একটা যুক্তি নির্ভর নয়।

আগেই বলেছি, আদিম সমাজে একাধিক কারণে প্রথার উদ্ভব হতে পারে এবং প্রথার সঠিক কারণ নির্ণয় করা দুরূহ। মাতৃসূত্রীয় প্রথার একাধিক কারণ উড়িয়ে দেয়া যায় না। অনেক উপজাতিতে বিয়ের পরে স্ত্রী স্বামীর ঘরে আসেনা, স্বামী নিজ গৃহের পাট তুলে স্থায়ীভাবে শ্বশুরালয়ে বসবাস করে। শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ স্ত্রীর গৃহে সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং সেখানে স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই সে মানুষ হয়। কাজেই স্বাভাবিকভাবে স্ত্রী ও তার আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সন্তানের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং স্ত্রীর পরিচয়ে পরিচিত হয়।

আদিম সমাজে সন্তান উৎপাদনে পিতার চেয়ে মাতার ভূমিকা অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশু সন্তান মাতৃস্তন্য পান করে বাঁচে এবং মায়ের কোলে–কাঁখে বড় হয়। মানবসন্তানকে বেশ কয়েক বছর মায়ের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়। কাজেই আদিম উপজাতিগুলোর ধারণায় সন্তানের সঙ্গে মায়ের ঘনিষ্ঠতা পিতার চেয়ে বেশি। মায়ের সঙ্গে সন্তানের তুলনামূলক ঘনিষ্ঠতা ও নির্ভরশীলতার জন্য মায়ের নামে সন্তানের পরিচয়দানের প্রথা প্রচলিত হবে এতে বিচিত্র কি।

যৌথ বিবাহ ও বহুপতিত্বের বিপক্ষে একগামী ব্যবস্থার প্রবক্তারা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে যুক্তি হিসেবে উপস্থাপিত করেন। তাদের মতে নারীর সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে পুরুষ অতিশয় ঈর্ষা পরায়ণ। সে যে নারীকে চায় তাকে সে পৃথিবীর অপর সকল পুরুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে কেবলমাত্র নিজের জন্য সংরক্ষিত করে রাখতে চায়। যে নারী তার প্রিয়, তাকে অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত দেখলে সে প্রবল ঈর্ষান্বিত হয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঈর্ষাপরায়ণ স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য পুরুষ তার বাঞ্ছিতাকে কখনও অপরের সঙ্গে ভাগ করে ভোগ করতে পারে না, এমন ভাগাভাগি বা যৌথ ব্যবস্থা মানুষের চরিত্র ও স্বভাবের পরিপন্থী। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি এই নির্দেশ করে যে, মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই স্বামী স্ত্রী হিসেবে জীবন শুরু করেছিলো এবং প্রত্যেক স্বামী প্রবল ঈর্ষার সঙ্গে নিজ স্ত্রীকে অপর সকল পুরুষের দৃষ্টি থেকে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলো। এই ব্যবস্থা ছিল একগামী বিবাহ।

যারা বলেন যে, মানুষ একদা বাছবিচারহীন যৌন জীবনযাপন করত, তাদের বিরুদ্ধবাদীদের মতে অবাধ যৌন মিলন মানুষের স্বভাব বিরুদ্ধ। বাবা-মেয়ে, মা-ছেলে ও ভাইবোন যৌন সংসর্গের প্রতি অনীহা মানুষের সহজাত। কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ এ ধরনের চিন্তা করতে পারে না। শুধু প্রবৃত্তি নয়, পরিবেশও এ ধরনের যৌন সংসর্গের প্রতিকূল। শিশুকাল থেকে যারা একসাথে বাস করে এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে মানুষ হয়, তাদের পরস্পরের মধ্যে যৌন আকর্ষণ রহিত হয়ে যায় ; এমনকি যৌন সম্পর্কের ব্যাপারে তাদের পরস্পরের প্রতি বিরূপতার উদ্ভব হয়। পিতামাতার ও সন্তান যেরূপ নিবিড় সান্নিধ্যে বাস করে সেইরূপ পরিবেশে তাদের পরস্পরের মধ্যে যৌন-বিরুদ্ধতা দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক ; তারা কদাপি পরস্পরে যৌন-মিলনের আকর্ষণ অনুভব করতে পারে না।

তবে এ কথা সত্য যে কোনো কোনো সমাজে ভাইবোন বিবাহ-ব্যবস্থার প্রমাণ আছে। প্রাচীন মিশরের রাজপরিবারে ভাইবোনে বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল। ক্লিওপেট্রার ছোট ভাই ক্লিওপেট্রার স্বামী ছিল। কিন্তু এ যৌন-সংসর্গ ছিল কিনা সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে। স্বামী তথা ভাইয়ের ঔরসে ক্লিওপেট্রার সন্তান হয় নি ; তাদের যৌনমিলনের উল্লেখ কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু জুলিয়াস সিজার ও এন্টনির ঔরসে যে ক্লিওপেট্রার সন্তান জন্মেছিল সে প্রমাণ আছে। বস্তুত মিশরীয় রাজপরিবারে ভাইবোনে বিবাহের উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক ; যৌন-মিলন নয়।

একগামী বিয়ের সমর্থকরা শুধুমাত্র মানুষের প্রবৃত্তির উল্লেখ করে ক্ষান্ত হন নি ; তাঁরা পশুজগৎ থেকেও উদাহরণ টেনেছেন। পাখি জাতীয় কতিপয় প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যে, শাবক মায়ের সঙ্গে যৌন-সম্পর্ক করে চলে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, কতিপয় জাতের পাখি পুরুষ স্ত্রী ও সন্তান একত্রে বাস করে। পুরুষ ও স্ত্রী পাখি একসঙ্গে মিলে নীড় রচনা করে, পুরুষ খড়কুটো জোগাড় করে আনে ; স্ত্রী ঘর বানায়। স্ত্রী পাখি সন্তানসম্ভবা হলে পুরুষ তার খাবার যোগায় এবং তার দেখাশুনা করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হওয়ার পর বাবা পাখি ও মা পাখি দুজনেই সন্তানের পরিচর্যা করে। সন্তান নিজের পায়ে না দাঁড়ানো পর্যন্ত বাবা ও মা তাকে মানুষ করার দায়িত্ব যৌথভাবে পালন করে।

কতিপয় বানরজাতীয় প্রাণীর মধ্যে একই ব্যবহার দেখা যায়। গরিলা ও শিম্পাঞ্জী স্বামী স্ত্রী ও সন্তান একত্রে বাস করে। স্বামী বাসস্থান নির্মাণ করে এবং স্ত্রী ও সন্তানকে রক্ষা করে। গরিলা ও শিম্পাঞ্জী বাবা মা ও সন্তান একসঙ্গে বিচরণ করে। কোনো বিপদ দেখলে বাবা চিৎকার করে স্ত্রী ও পুত্রকে সাবধান করে এবং তারা নিরাপদ আশ্রয় নেয়। তখন পিতা গরিলা বা শিম্পাঞ্জী একা শত্রুর মোকাবেলা করে। স্ত্রী সন্তান-সম্ভাবা হলে স্বামী সন্তান প্রসবের জন্য ঘর তৈরি করে দেয়। এই সকল পাখি ও বানরজাতীয় প্রাণীর মধ্যে একগামী ব্যবস্থা বিদ্যমান। স্বামী স্ত্রী ও সন্তান

একসাথে বাস করে। স্ত্রী সন্তান লালন পালন করে। স্বামী পরিবারের অভিভাবক হিসেবে প্রতিপালক ও রক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

মানবেতর প্রাণীর মধ্যে যদি এই ব্যবস্থা হয়, তবে মানুষের মধ্যে হবে না কেন? মানুষ প্রাণীদের চেয়ে বুদ্ধি ও মস্তিষ্কে অনেক উন্নত। কাজেই তাদের মধ্যে যৌন-অরাজকতা আরোপ করা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের অবমাননার নামান্তর। পরিবেশগত কারণে আদিম মানুষের মধ্যে স্বামী স্ত্রী ও পুত্র একত্রে পুরুষের হেফাজতে বাস করার প্রয়োজন মানবেতর প্রাণীর চেয়ে অনেক বেশি ছিল। কারণ আদিম মানুষকে জীবজন্তুর মতোই বনেজঙ্গলে ঘুরে ফলমূল সংগ্রহ করতে হতো। কিন্তু তার দৈহিক শক্তি ছিল কম, পালাবার শক্তি কম ছিল এবং শত্রুর সঙ্গে লড়বার অবলম্বনের অভাব ছিল। তারপর মানুষ যখন পশু শিকার করতে শিখলো তখন বিপদের আশংকা বৃদ্ধি পেলো। শুরু থেকেই শিকারের ভার পড়েছিল পুরুষের ওপর। এ অবস্থায় মার একার পক্ষে নিজের ও সন্তানের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা মূলত অসম্ভব ছিল। সন্তানসম্ভবা নারীর পুরুষের উপর নির্ভর না করে উপায় ছিল না। সুদূর আদিম যুগে জীবিকার রূঢ় প্রয়োজনে নারীকে নিজের ও সন্তানের দায়িত্ব পুরুষের ওপর ন্যস্ত করতে হয়েছিল। কাজেই কঠোর ও প্রতিকূল বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আদিম মানুষ স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান মিলে বাস করতে বাধ্য হয় এবং মানবজাতির যাত্রাপথে কখনও বিবাহহীন জীবন যাপন করতে পারে নি। সৃষ্টির শুরু থেকেই স্ত্রী সন্তান প্রতিপালক এবং স্বামী স্ত্রী ও সন্তানের রক্ষক এই নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল। বানর জাতীয় প্রাণীর মধ্যে স্বামী স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে যে জীবনব্যবস্থা গঠিত হয়েছিল সেই ব্যবস্থাই একগামী বিবাহ হিসেবে মানব জাতিতে প্রচলিত হয়েছিল।

মানুষ সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে একগামী এ অনুমান সত্য বলে মেনে নিতে আমাদের মন চায়। কারণ আমরা যারা সভ্য দুনিয়ার বাসিন্দা একগামী বিয়ে তাদের রুচি ও শালীনতাবোধের সঙ্গে মিলে যায়। আধুনিক পুরুষ এমন একজন নারীকে পেতে চায় তার কাছে দেহ মন সঁপে দেবে

এবং দ্বিতীয় কোনোও পুরুষের কথা ঘুণাক্ষরেও মনে স্থান দেবে না। নারীও চায় এমন পুরুষ যে একান্তভাবে তার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হবে। স্ত্রীর পর-পুরুষ আসক্তি পুরুষ কখনও ক্ষমা করে না। তাই নারীর সতীত্ব প্রায় সব সমাজেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আদিম অনেক উপজাতিতে নারীর সতীত্বকে রক্ষা করার ব্যবস্থা আছে। দায়াক উপজাতিতে ছেলেমেয়েদের মেলামেশা নিষিদ্ধ ; অবিবাহিতা কুমারীর সন্তান হ্যে দেবতার কোপ পতিত হয় বলে দায়াকরা বিশ্বাস করে। মধ্য এশিয়ার কতিপয় উপজাতিতে কুমার ও কুমারীদের গ্রামের দুই বিপরীত প্রান্তে নির্দিষ্ট ঘরে থাকতে হয় : ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না ; এমনকি একজন কুমারের একজন কুমারীর মুখ দর্শন নিষিদ্ধ। নিউগিনির উপজাতিগুলোতে বিবাহিতা রমণী ও কুমারী উভয়কেই সতীত্ব রক্ষা করে চলতে হয়। পদস্খলনের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। অনুসন্ধানে দেখা গেছে যে, লয়ালটি দ্বীপের উয়ি উপজাতির মেয়েরা বিয়ের আগে সতীত্ব রক্ষা করে এবং বিয়ের পরে স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকে। নিউ সাউথ ওয়েলসের উপজাতির সামাজিক অনুষ্ঠানে অবিবাহিত যুবকদের আসন নির্দিষ্ট থাকে অনুষ্ঠান স্থানের শেষ প্রান্তে এবং কুমারী ও বিবাহিতা মহিলাদের সঙ্গে অবিবাহিত যুবকদের কথা বলতে দেওয়া হয় না। অষ্ট্রেলিয়ার কতিপয় উপজাতিতে নারীর সতীত্বকে এতবেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় যে, অবৈধ সন্তান জন্ম দিলে কুমারী মাতাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয় এবং ঐ একই অগ্নিকুণ্ডে অবৈধ সন্তানকেও নিক্ষেপ করা হয়। অবৈধ সন্তানের জন্মদাতা পুরুষকেও কঠোর সাজা দেওয়া হয় ; এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হয়। আফ্রিকার কতিপয় উপজাতিতে যে পুরুষ অবিবাহিতা কুমারীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক করে তার সঙ্গে ঐ কুমারীর বিয়ে দেওয়া হয় এবং জরিমানা হিসেবে মেয়ের বাপকে অর্থ প্রদানের বাধ্য করা হয়। অবৈধ মিলনে সন্তান হলে সন্তানের জন্মদাতাকে এমন উচ্চহারে জরিমানা করা হয় যে, কোনো পুরুষ অবিবাহিতা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে ভয় পায়। উত্তর

আমেরিকার বিভিন্ন উপজাতিতে মেয়েরা ঐতিহ্যগতভাবে সৎচরিত্রের অধিকারী বলে আদৃত হয়, পুরুষের পদস্খলনকে নারীর পদস্খলনের চেয়ে অধিকতর কঠোরতার সঙ্গে দমন করা হয়। কাজেই আদিম উপজাতিগুলোতে কখনও বাছবিচারহীন যৌন মিলনের প্রচলন ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

তবে এ কথাও ঠিক যে কোনো কোনো আদিম সমাজে নারীপুরুষের সম্পর্ক অনেকটা শিথিল। আফ্রিকার এমন উপজাতি আছে যেখানে প্রত্যেক পুরুষের নিজস্ব স্ত্রী আছে ; কিন্তু উপজাতির অন্যান্য সদস্য ঐ স্ত্রীর সঙ্গে যৌন-সঙ্গ করতে পারে, অর্থাৎ উপজাতির যে কোনো সদস্য উপজাতির অন্য যে কোনো সদস্যের স্ত্রীর সঙ্গে যৌন-সঙ্গ করতে বাধা নেই। এস্কিমোরা অতিথি পরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নিজের স্ত্রীকে অতিথির কাছে ধরে দেয়। শোশোনিয়ান গোত্রে স্বামী শিকারের খোঁজে দূরে গেলে ফিরে না আসা পর্যন্ত স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে বাস করতে পারে। গ্রিনল্যাণ্ডে সেই পুরুষকে সবচেয়ে মহৎ ও উত্তম মনে হয় যে তার স্ত্রীকে বন্ধুদের ধার দেয়। তিব্বতের কতিপয় উপজাতির বিশ্বাস এই যে, স্ত্রীকে বন্ধুবান্ধবদের ভোগে লাগালে দেবতা প্রীত হন। পূর্ব-মধ্য আফ্রিকার কতিপয় উপজাতিতে বিচিত্র প্রথার সাক্ষাৎ মেলে। বিয়ের পর পরই বধূ পালিয়ে যায় এবং কোনোও গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকার ভান করে। তখন বর ও তার অন্তরঙ্গ বন্ধুরা তাকে খুঁজে বের করে। বধূকে খুঁজে বের করতে করতে সাহায্য করার পারিতোষিক হিসেবে ঐ বন্ধুরা বধূকে ভোগ করার অধিকার লাভ করে এবং তাকে ভোগ করে।

অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতিগুলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সবাই মিলে আনন্দ ও হৈ হুল্লোড়ে গা ভাসিয়ে দেয়। এসব অনুষ্ঠানে তারা নিষিদ্ধ যৌন-সম্পর্ক করে, স্বামীরা স্ত্রী বদল করে। পৃথিবীর নানা উপজাতিতে নারী-পুরুষ দৈনন্দিন জীবনে সংযত যৌনজীবন যাপন করে ; স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা নিয়ে একগামী জীবন যাপন করে। কিন্তু বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে তাদের

মধ্যে যৌন-সম্পর্কের বাঁধ ভেঙে যায়, তারা বাছবিচারহীন যৌন-সংসর্গে লিপ্ত হয়।

এসব যথেচ্ছাচারের উদাহরণকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতায় যৌন জীবনে কিছু কিছু শিথিলতা দেখা যায়। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে ইউরোপ আমেরিকার বিবাহযোগ্যা তরুণীর উল্লেখযোগ্য অংশ বিয়ের আগেই যৌন-অভিজ্ঞাতা লাভ করে থাকে। তরুণদের বেলায় এর ব্যতিক্রম নয়। পাশ্চাত্যের পারমিসিভ সমাজে সোয়াস পার্টি, নাইটক্লাব, স্ট্রিপ-স্টিজ, লাইটস অফ কিছু কিছু আদিম সমাজের যৌন-শিথিলতার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু এ সকল ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তিতে এক হাজার বছর পরের কোনো নৃবিজ্ঞানী যদি আজকের পাশ্চাত্য সমাজকে বাছবিচারহীন যৌন-জীবনে অভ্যস্ত সমাজ বলে চিহ্নিত করে তবে তা কি সঠিক হবে?

আজকের পৃথিবীতে বসবাসকারী সকল উপজাতি ও আদিবাসীর মধ্যে কোনো না কোনো প্রকারের বিবাহ-বন্ধন প্রচলিত আছে। মানব ইতিহাসের কোনো স্তরে মানুষের বিবাহহীন জীবন যাপনের প্রমাণ আমাদের হাতে নেই। অতি দূর অতীতে মানবসৃষ্টির প্রথম স্তরে মানুষ হয়তবা বিবাহ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল। কিন্তু এই অজ্ঞতা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং ক্ষণকালীন। মানুষ অতিদ্রুত বিবাহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে এবং বাছবিচারহীন যৌন জীবন পরিহার করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে। মানুষের বিবাহহীন জীবনের স্থায়িত্ব এত ক্ষণস্থায়ী ছিল যে, তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

বিয়েরআচারঅনুষ্ঠান

আমরা বলেছি যে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাধারণত বিয়ে হয়। কিন্তু যে কোনো পুরুষ কি যে কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে পারে? যে কোনো নারীর সঙ্গে কি যে-কোনো পুরুষের বিয়ে হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা সবাই জানি — সব পুরুষ ও সব মেয়ের মধ্যে বিয়ে সম্ভব নয়। পিতার সঙ্গে কন্যার, মাতার সঙ্গে পুত্রের, সহোদর ভাইয়ের সঙ্গে সহোদর বোনের বিবাহ অচিন্তনীয়।

কাজেই বলা যায় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের নিষিদ্ধ গণ্ডি আছে। এই গণ্ডির মধ্যে পড়ে এমন নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ হয় না। নিষিদ্ধ গণ্ডির লঙ্ঘন করাকে ইংরেজিতে বলে ইনসেস্‌ট (incest)।

আধুনিক সমাজে পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্র, সহোদর ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে ইনসেস্‌ট অর্থাৎ নিষিদ্ধ গণ্য হয়। পাশ্চাত্যে এবং আমেরিকায় এ ধরনের বিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। ইসলাম ধর্মে বিবাহের নিষিদ্ধ সীমা সুনির্দিষ্ট করে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। তবে আধুনিক সব সমাজে ইনসেস্‌টের ধারণা এক নয়। মুসলমান সমাজে সম্পর্কীয় ভাইবোন অর্থাৎ কাজিনদের মধ্যে বিয়ে হতে পারে কিন্তু সনাতন হিন্দু সমাজে রক্ত সম্পর্কীয় ভাইবোনের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। অপরপক্ষে একজন মুসলমান স্বামী একসঙ্গে দুই সহোদর ভগ্নীকে বিবাহ করতে পারে না। একজন হিন্দু স্বামী একইসঙ্গে দুই সহোদর বোনকে পত্নীত্বে বরণ করতে পারে। তাতে কোনো বাধা নেই। অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতিগুলোতে একসঙ্গে একাধিক

বোনকে বিবাহ্ করাকে আদর্শ বিবাহ্ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আফ্রিকার জুলুদের মধ্যে দুইবোনের সঙ্গে বিবাহ্ প্রচলিত। এমনকি, স্ত্রী স্বামীকে তার ছোট বোনকে বিয়ে করতে প্ররোচিত করে। অপরপক্ষে, সোয়ানা গোত্রে স্ত্রীর দূর সম্পর্কের বোনের সঙ্গেও বিবাহ্ নিষিদ্ধ।

ইনসেস্‌টের সবচেয়ে বৈচিত্র্য দেখা যায় আদিম উপজাতিগুলোতে। এমন সমাজ আছে যেখানে নিকটতম আত্মীয়, যেমন ভাইবোন বিবাহ্ প্রচলিত আছে। আবার এমন সমাজ আছে যেখানে সামান্যতম রক্তের বা সম্পর্কের বন্ধন আছে এমন নারী পুরুষে বিবাহ্ অচল। আদিম অনেক রাজতন্ত্রে রাজপরিবারে ভাইবোনে বিবাহ্ সাধারণ নিয়ম ছিল। প্রাচীন মিশর, ইনকা, হাওয়াই ও আজান্দে সমাজে রাজা নিজের সহোদর বোনকে বিয়ে করতেন। আজান্দের ভনগোরা রাজপরিবারে পিতা কন্যার যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল না। এতো গেল রাজপরিবারের কথা, প্রাচীন মিশরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে ভাইবোনে বিবাহ্ ব্যবস্থা চালু ছিল। আফ্রিকায় কোনো কোনো উপজাতিতে বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রিয় ভাইবোনে বিবাহ্ সমাজ অনুমোদিত। পিতা ও কন্যা, মাতা ও পুত্র এবং সহোদর ভাইবোনে বিবাহ্ নিষিদ্ধ হলেও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের মধ্যে বিবাহের প্রথা বিভিন্ন উপজাতিতে প্রচলিত আছে। আফ্রিকার এন্‌গোণ্ডি ও হেঙ্গা উপজাতিতে নাতনী মাতামহী ও পিতামহীকে বিয়ে করা চলে। অনেক সমাজে ভাইয়ের মেয়ে এবং বোনের মেয়েকে বিয়ে করার ব্যবস্থা আছে। কতিপয় উপজাতিতে পুরুষ প্রথাগতভাবে স্ত্রীর ভাইয়ের মেয়েকে বিয়ে করে।

বিভিন্ন উপজাতি সমাজে কাজিন বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। তবে এখানেও বৈচিত্র্য আছে। কাজিন হলেই যে বিয়ে করা চলবে তা নয়। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ফরমোসার বুনুন উপজাতিতে প্রথম সারির কাজিনদের মধ্যে বিয়ে চলে না ; পায়য়ুমা উপজাতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় সারির কাজিনদের মধ্যে বিবাহ্ নিষিদ্ধ। মধ্য আমি উপজাতির নারী পুরুষ চতুর্থ সারি পর্যন্ত কাজিনকে বিয়ে করতে পারে না। আফ্রিকার

নুয়ের উপজাতি আর এক ধাপ এগিয়ে। তারা ছয়সারি পর্যন্ত কাজিনদের ইনসেস্ট গণ্ডিতে রাখে।

কিন্তু বৈচিত্র্যের এখানে শেষ নয়। অনেক উপজাতি বিয়ের জন্য কাজিনদের দুই শ্রেণীতে ফেলে। যথা বিপরীত কাজিন ও সমান্তরাল কাজিন। আমার ফুপাতো ভাইবোন অর্থাৎ আমার বাবার বোনের ছেলেমেয়ে আমার বিপরীত কাজিন ; অনুরূপভাবে আমার মামাতো ভাইবোন অর্থাৎ মার ভাইয়ের সন্তান আমার বিপরীত কাজিন। অপরপক্ষে আমার চাচাতো ভাইবোন অর্থাৎ বাবার ভাইয়ের সন্তান আমার সমান্তরাল কাজিন ; অনুরূপভাবে আমার খালাতো ভাইবোন অর্থাৎ মার বোনের সন্তান আমার সমান্তরাল কাজিন। অনেক উপজাতিতে বিপরীত কাজিন বিবাহ নিষিদ্ধ ; আবার অনেক উপজাতিতে সমান্তরাল কাজিন বিয়ে নিষিদ্ধ। আফ্রিকার সেয়াজী উপজাতিতে সমান্তরাল কাজিনদের মধ্যে বিয়েকে ইনসেস্ট গণ্য করা হয় ; কিন্তু বিপরীত কাজিন বিবাহকে উৎসাহিত করা হয়। সোয়ানা গোত্রে বিপরীত কাজিনদের মধ্যে বিয়েকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

তবে এমন সমাজ আছে যেখানে সকল রকম কাজিনদের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার ভিত্তি এই যে, যাদের মধ্যে সামান্যতম রক্তের বন্ধন বা কুটুম্বিতা আছে তাদের মধ্যে বিবাহ হতে পারে না। পলিনিশিয়ায় রক্ত সম্পর্ক আছে এমন নারী পুরুষের মধ্যে বিবাহের প্রচলন নেই। উত্তর আমেরিকার ইফেট উপজাতিতে পিতা বা মাতার গোত্রের কোনো নারী বা পুরুষকে বিবাহ করাকে ঘোরতর অপরাধ পরিগণিত হয়। আফ্রিকার বান্টুগোত্রে যত দূর সম্পর্কেরই হোক না কেন, রক্তের সম্পর্ক থাকতে পারে এমন নারী পুরুষে বিবাহ নিষিদ্ধ। পাছে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে পড়ে তাই বান্টু যুবক তার নিজ গোত্রের বাইরের কোনো মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না ; যদি সেই মেয়ের পারিবারিক পদবির সঙ্গে তার নিজেদের পারিবারিক পদবির মধ্যে কোনো মিল দেখা যায়। আফ্রিকার লোভি গোত্রে আত্মীয় স্বজনের আত্মীয় স্বজনকেও

আত্মীয়গণ্য করা হয়। ফলে রক্ত সম্পর্ক নেই কিন্তু পরোক্ষভাবে আত্মীয় বলে পরিগণিত মেয়ে পুরুষের মধ্যে বিয়ে হয় না।

বিয়ের নিষিদ্ধ গণ্ডির ব্যাপারে বিভিন্ন সমাজের ধ্যান ধারণায় মিল না থাকলেও সকল সমাজেই ইন্‌সেস্‌টের স্বীকৃতি আছে। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্তে অবস্থিত নানা উপজাতির মধ্যে ইনসেস্‌টের মূলসূত্রটি কিভাবে সঞ্চারিত হলো?

ইনসেস্‌টের ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীরা বিশদ গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ করেছেন ; তবে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। কেউ কেউ জোর দিয়েছেন মানুষের সহজাত মনঃস্তত্ত্বের উপরে। তাদের মতে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ইনসেস্‌ট অনুমোদন করে না। অতি নিকট আত্মীয়ের সাথে যৌনাচার মানুষের প্রবৃত্তি বিরোধী। তাছাড়া যারা বহুদিন পরস্পরের সাথে একত্রে বাস করে তাদের মধ্যে যৌন আকর্ষণ রহিত হয়ে যায়। মা বাবার নিকট সান্নিধ্যে ও যত্নে সন্তান বড় হয়। ফলে মা বাবা ও ছেলে মেয়দের মধ্যে যৌন বিরূপতা জন্মে এবং তারা পরস্পরের সঙ্গে যৌন সংসর্গের কথা চিন্তা করতে পারে না।

ফ্রয়েড বলেন, মানুষের মনে পরস্পর বিরোধী চিন্তাভাবনা যুগপৎ ভীড় করে। মানুষ সজ্ঞানে যে ধারণাকে পরিহার করে চলে, সেই ধারণাই সে হয়ত মনের মণিকোঠায় পোষণ করে রাখে। মাতাপুত্র, পিতা–কন্যা ও ভাইবোনের মধ্যে আপাত সম্পর্কের পিছনে ঠিক একটি বিপরীত মনোভাব বিরাজ করে। ফ্রয়েডের মতে মনের এই বিপরীত ভাবকে প্রতিহত করার জন্য বাহ্যিকভাবে মানুষ ইনসেস্‌ট বিরোধী কার্যক্রম গ্রহণ করে। মাতা–পুত্র, পিতাকন্যা ও ভাইবোন বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণার কারণ এই মনগত বিভেদ।

ফ্রয়েড বলেন, মানুষের আদিতম সামাজিক সংগঠনের প্রধান ছিল সেই পিতা যার একাধিক স্ত্রী ছিল, যে ছিল দুর্ধর্ষ এবং ঈর্ষাপরায়ণ। সে নিজে স্বয়ং নিজের কন্যাদের সঙ্গে যৌনাচারে লিপ্ত ছিল, কিন্তু পুত্রদের নিজ স্ত্রী ও কন্যাদের সান্নিধ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। পুত্ররা এই

ব্যবস্থা মেনে নিতে পারে নি ; তারা জোট বেঁধে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং পিতাকে হত্যা করে মা ও বোনদের হস্তগত করে। কিন্তু যে বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তারা পিতৃহন্তা হয়েছিল, সে বাসনা পূরণ করতে গিয়ে তারা বাধা পেলো নিজেদের অনুশোচনা ও অপরাধবোধের কাছে। পিতৃহন্তার পাতক তাদের এমন ভাবে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরতে লাগলো যে মা ও বোনদের উপভোগের আনন্দ প্রকৃতপক্ষে বিষাদে পরিণত হলো। তারা ভীতি ও অপরাধবোধের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় মা ও বোনদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ থেকে বিরত হলো এবং মাপুত্র ও ভাইবোন যৌন সংসর্গ নিষিদ্ধ ঘোষণা করলো।

ফ্রয়েডের বর্ণনা সম্পর্কে একথা বলাই যথেষ্ট যে, তাঁর কাহিনীর সত্যতা যাচাইয়ের কোনো উপায় নেই।

নিষিদ্ধ বিবাহ সম্পর্কে আর একটি মতজনিত কারণের উপর জোর দিয়েছে। প্রত্যেক বংশেই কিছু কিছু জনিত দোষক্রটি থাকে। ঐ বংশসম্ভূত নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ হতে থাকলে বংশগত দোষক্রটিগুলো ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করতে পারে এবং পরিণামে ঐ বংশের ধ্বংস বা পতন ঘটা অস্বাভাবিক নয়। আদিম যুগে যে সকল সমাজে নিকট আত্মীয় স্বজনের মধ্যে বিয়ে প্রচলিত ছিল সেগুলোতে বংশগত দোষক্রটি বেড়ে গিয়ে নানা দুর্বলতা এবং দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এ সব অসুবিধা সৃষ্টি হওয়ায় নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে আদিম মানুষ নিজের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে পাত্রপাত্রী খুঁজতে বাধ্য হয়েছিলো এবং নিকটাত্মীয় মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হয়েছিলো।

এই ব্যাখ্যার একটি বড় অসুবিধা এই যে, বংশে যেমন দোষক্রটি থাকে তেমনি নানা গুণ ও শ্রেষ্ঠত্বও থাকে। নিকটাত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে হলে ঐ সকল গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব জোরদার হয়। পরবর্তী পুরুষ ভেঙে পড়ার বদলে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

একদল নৃবিজ্ঞানী আছেন যারা সকল প্রতিষ্ঠান ও আচার অনুষ্ঠানকে তাদের কার্যকারিতার আলোকে বিচার করে থাকেন। বিবাহিত জীবনের

শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির জন্য ইনসেস্ট নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছিলো। পিতামাতা, পুত্রকন্যা নিয়ে একটি সংসক্ত ও সংহত সামাজিক সংগঠন, যাকে বলা হয় পরিবার। পারিবারিক শান্তি ও সংহতির জন্য পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতির বন্ধন ও সমঝোতা একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু পুত্র যদি মাতার যৌনজীবনে পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী হয় এবং কন্যা যদি হয় মাতার প্রতিদ্বন্দ্বী, ভাইয়েরা যদি বোনদের অনুরাগভাজন হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অবতীর্ণ হয় তবে পরস্পরে ঈর্ষা ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং পরিবারের শান্তি ও সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়।

বিয়ে সবদেশে সব সমাজে সব যুগে সংঘটিত হচ্ছে। কোনো দুজনের মধ্যে বিয়ে হবে তা কে বা কারা নির্ধারণ করে? প্রধানত দুই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, প্রথমত গুরুজন বা অভিভাবকগণ বিয়ে ঠিক করে থাকেন, দ্বিতীয়ত ছেলেমেয়ে নিজেরাই পছন্দ করে নিজেদের বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথম ব্যবস্থায় যাকে বলা হয় আয়োজিত বিয়ে, পিতামাতা বা অভিভাবকগণ পুত্র কন্যার জন্যে পাত্রপাত্রী পছন্দ করেন। পুত্র বা কন্যা বিবাহযোগ্য হলে তারা দেখে শুনে আকাঙ্খিত পাত্রপাত্রী পছন্দ করেন। ছেলেপক্ষ ও মেয়েপক্ষ উভয়ের পছন্দ হলে ছেলের অভিভাবক আনুষ্ঠানিকভাবে মেয়ের অভিভাবকের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যান এবং উভয়পক্ষ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিয়ে পাকাপাকি করেন। আয়োজিত বিয়েতে অভিভাবকের মতামত মুখ্য এবং পাত্রপাত্রীর মতামত গৌণ এমনকি অনেক ক্ষেত্রে মেয়ের মতামতের কোনো দামই দেয়া হয় না। আয়োজিত বিয়ে প্রধানত সনাতন সমাজগুলোতে প্রচলিত। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা রয়েছে। কোনো কোনো আদিম সমাজে আয়োজিত বিয়ে ব্যবস্থা ওপ্রচলিত। আফ্রিকার নুরা উপজাতিতে অতি অল্প বয়সে অভিভাবকগণ ছেলেমেয়ের বাক্‌দান করেন।

আগেই বলেছি যে ছেলেমেয়ে নিজেরা উদ্‌যোগী হয়েও বিয়ে ঠিক করে। এই ব্যবস্থায় ছেলে ও মেয়ে অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে একে

অপরকে জীবনসঙ্গি হিসেবে পছন্দ করে। এতে তারা দীর্ঘ সময় ধরে একে অপরকে চিনবার সুযোগ পায়। তারা নিজেরা মতৈক্যে এসে তাদের সিদ্ধান্ত অন্যদের জানায়। তবে বিয়ের আগে মেলামেশার সময়ের সীমারেখা নির্দিষ্ট নেই ; কখনও কয়েকমাস হতে পারে আবার কোনো ক্ষেত্রে কয়েক বছরও হয়ে থাকে। বিয়ের পূর্বে অবিবাহিত তরুণ তরুণীর মেলামেশার মাধ্যমে জীবনসাথী নির্বাচন করার রীতিকে ইংরেজিতে বলা হয় কোর্টশীপ (courtship)। এ ধরনের ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশগুলোতে প্রচলিত। এ সকল দেশের তরুণ-তরুণীরা কল্পনাও করতে পারে না যে অভিভাবক ছেলেমেয়ের জন্য পাত্রপাত্রী নিবার্চন করে দিতে পারেন। বিয়ের ব্যাপারে এখানে ছেলে ও মেয়ে পছন্দই প্রধান।

পাশ্চাত্য সমাজ ছাড়াও অনেক আদিম সমাজে এ ধরনের রীতি প্রচলিত। আমাদের দেশে পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী টিপরা উপজাতিতে বিয়ের ব্যাপারে ছেলেমেয়ের পছন্দ-অপছন্দই মুখ্য। বাবা-মার মতামত নগণ্য। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আদিবাসী সামোয়া সমাজে নারীপুরুষ নিজেদের পছন্দমতো বিয়ে করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তরুণ-তরুণী নিজ নিজ পছন্দের মেয়ে বা ছেলেকে স্ত্রী বা স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারে। মালয় উপদ্বীপের সেমাঙদের মধ্যে যুবক-যুবতীর পছন্দ অনুযায়ী বিয়ে হয়। রামায়ণ মহাভারতে রাজবংশের মেয়েদের স্বামী নির্বাচনের একটি বিশেষ পদ্ধতির উল্লেখ পাওয়া যায়। একে বলে স্বয়ম্বর প্রথা। রাজপরিবারের মেয়েদের স্বামী নির্বাচনের সুযোগ দেয়া হতো। আনুষ্ঠানিকভাবে তারা স্বামী পছন্দ করে নিতো। রাজ্যময় ঘোষণা দেয়া হতো যে রাজকুমারী তার ভাবীবরের গলায় মাল্যদান করবেন। নির্দিষ্ট দিনে রাজদরবার উপস্থিত হতেন পাণি প্রার্থীগণ। রাজকুমারীকে আমন্ত্রণ জানানো হতো — তার স্বামী নিবার্চন করতে। মালা হাতে রাজকুমারী রাজ দরবারে উপস্থিত প্রার্থীগণকে অবলোকন করতেন এবং তার পছন্দমতো ব্যক্তিটির গলায় মালা পরাতেন।

অভিভাবক আয়োজিত বিয়েই হোক বা নিজেদের পছন্দ করা বিয়ে হোক — বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পরের প্রশ্নটি হলো — বিবাহিত দম্পতি নীড় বাঁধবে কোথায়। একজন পুরুষ ও একজন মহিলা — যারা দুটি পরিবার থেকে এসে জোট বাঁধলো — একে অপরকে জীবনসাথীরূপে বরণ করলো — তারা বিয়ের পর মুহূর্ত থেকে কোথায় বাস করবে। এ ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত ; প্রথমত বিয়ের পরে স্ত্রী স্বামীর সাথে চলে যায় এবং স্বামীর পিতৃগৃহে বাস করে ; দ্বিতীয়ত স্বামী তার নিজ পরিবার ত্যাগ করে স্ত্রীর পিতৃগৃহে থাকে। প্রথমোক্ত ব্যবস্থাকে পিতৃবাস, দ্বিতীয় ব্যবস্থা মাতৃবাস।

বর্তমান বিশ্বে পিতৃবাস ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত। আমাদের দেশেও এই রীতি রয়েছে। বিয়ের পরেই কন্যা পিতৃগৃহ ছেড়ে চলে যায় স্বামীর সাথে। পিতৃবাস ব্যবস্থা বহুল প্রচলিত হলেও, মাতৃবাস ব্যবস্থা এখনো টিকে আছে অনেক সমাজে, বিশেষ করে অনেক উপজাতি সমাজে এই প্রথার সাক্ষাৎ মেলে। বাংলাদেশে গারো উপজাতি সমাজে এখনো মাতৃবাস ব্যবস্থা বিদ্যমান। বিয়ের পরে স্বামী স্ত্রীর সাথে নীড় বাঁধে শ্বশুরালয়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা ও মগদের মধ্যে স্ত্রীর পিতার পুত্র সন্তান না থাকলে বর বিয়ের পরে স্ত্রীর বাবার পরিবারে বাস করে। এ প্রসঙ্গে আমাদের ঘরজামাই রীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে ছেলে বিয়ের পরে শ্বশুরালয়ে বাস করে তাকে আমাদের দেশে ঘরজামাই বলা হয়। ঘরজামাই মাতৃবাস প্রথার অনুরূপ। ঘরজামাই থাকাটা এদেশে স্বাভাবিক ঘটনা নয় ; কদাচিৎ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ ঘরজামাই থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতি সমাজে মাতৃবাস প্রথার বিচিত্র রূপ দেখা যায়। জাপানদেশের আদিবাসী আইনুদের নিয়ম অনুযায়ী সাধারণত নববিবাহিত দম্পতি মেয়ের বাবার ঘরের কাছে নতুন করে ঘর বানিয়ে বাস করে। মালয় উপদ্বীপের আদিবাসী সেমাঙদের মধ্যে বিয়ের পর নবদম্পতি জঙ্গলে চলে যায় মধুচন্দ্রিমা পালনের জন্যে, এরপর তারা কনের বাবার দলে যোগ দেয় এবং সেখানে ঘর করে বছর দুই বাস করে।

পরে ছেলের বাবার দলে চলে আসে। আমেরিকার ইরাকু ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে বিয়ের পর স্বামী তার পরিবারে বাস করতে যায়।

বিয়ের অনুষ্ঠানের কথা মনে হলেই সাধারণত একজোড়া তরুণ-তরুণীর কথা মনে আসে। কিন্তু বিয়ে যে সবসময় তরুণ-তরুণীর মধ্যেই হবে তা নয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে কোনো সময়েই বিয়ে হতে পারে, বিয়ের কোনো বয়স নেই। অনেক সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পরই বাগদান হয়ে থাকে, আবার আফ্রিকার যে সব উপজাতিতে বধূপণের বড় কড়াকড়ি সেখানে অনেক যুবককেই মধ্যবয়স পর্যন্ত বিয়ের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। সাধারণভাবে দেখা যায় যে বরের বয়স কনের বয়সের চেয়ে বেশি। আফ্রিকার নায়াকিউসা গোত্রে বর ও বধূর মধ্যে দশ বছরের তফাৎ থাকে — বর বধূর চেয়ে দশ বছরের বড় হয়। আবার কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রীর বয়স স্বামীর বয়স অপেক্ষা বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের তাঙাচাঙ্গিয়াদের মধ্যে স্ত্রীকে অবশ্যই বয়সে স্বামীর বড় হতে হবে।

আমরা আগেই বলেছি যে অনেক সমাজে অতি অল্প বয়সে এমনকি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরপরই বাগদান হয়ে থাকে ; অনেক স্থানে শৈশবেই বিয়ে হয় ; অনেক বালিকাকে ধূলোয় গড়াগড়ি খেলার বয়সে যেতে হয় শ্বশুরবাড়ি। এ ধরনের বাল্যবিবাহ আমাদের দেশে সামাজিকভাবে স্বীকৃত। সুপ্রাচীনকাল থেকে এই রীতি চলে আসছে। শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ উপন্যাসের নায়ক উচ্চশিক্ষিতি জমিদার পুত্র চন্দ্রনাথের দশম বর্ষীয় সরযুকে দেখে মনে হয়েছিলো। "এতরূপ আর জগতে নাই", এর এক মাসের মধ্যেই তাকে বিয়ে করেছিলো। কবি রবীন্দ্রনাথ 'বালিকাবধূ' সম্পর্কে কবিতা রচনা করেছেন। অবিবাহিত ষোড়শীর পিতাকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়, নাবালিকা অবস্থায় কন্যার বিয়ে হবে এটাই এ সমাজের প্রাচীন প্রথা।

বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য এদেশে প্রথম আইন পাশ করা হয় ১৯২৯ সালে। এই আইনের নাম Child Marrige Restraint Act। উক্ত আইনে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে বিধান করা হয় যে ১৫ বছরের

কম বয়সী মেয়ের এবং ১৬ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়ে হতে পারবে না ; হলে তা আইনত দণ্ডনীয় হবে। পরে ১৯৬১ সালে মুসলিম পরিবার আইন অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এতে ১৬ বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং ১৮ বছরের কম বয়সী ছেলের বিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়। অতি সম্প্রতি ১৯৮৪ সালে এই বয়সসীমা মেয়েদের জন্য ১৮ এবং ছেলেদের জন্য ২১ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।

কিন্তু ১৯২৯ সালে যেমন ১৯৮৪ সালেও তেমনি আইন করে বাল্যবিবাহ বন্ধ করা যায় নি। বাল্যবিবাহ এখনো এদেশে হচ্ছে। এখনো আট বা দশ বছরের বালিকার বিয়ে হওয়া অসম্ভব ঘটনা নয়। আমরা খবরের কাগজে বাল্যবিবাহ হওয়ার খবর পড়ি ; গ্রামে-গঞ্জে নিজেরা প্রত্যক্ষ করি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে দুবছরের নাবালিকারও বিয়ে হয়। আমিনার বয়স ৬, সে রাজশাহীর চাপাই নবাবগঞ্জের হানিফ মিয়ার দ্বিতীয় মেয়ে। আমিনার বড় বোন শাহিনা — তার বয়স ৯ বছর। আমিনা ও শাহিনা — দুবোনেরই বিয়ে হয়েছে। শাহিনার বিয়ে হয়েছে ১১ বছরের বালক আলম মিয়ার সাথে, এবং আমিনার বিয়ে হয়েছে ৯ বছরের বালক নূর ইসলামের সাথে। তাদের বাবা মেয়ে দুটিকে বিয়ে দিতে পেরে খুশি। তার মতে মেয়েদের লেখাপড়া করিয়ে কি লাভ। ছেলেমেয়েদের কত বছর বয়সে বিয়ে হওয়া উচিত, কত বছর বয়স তাদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে এ ব্যাপারে কিছুই জানে না হানিফ মিয়া। (দৈনিক সংবাদ, ২৯ আশ্বিন, ১৩৯২সাল)।

হানিফ মিয়ার মতো অসংখ্য পিতা আইনের কোনো খবর রাখে না এবং এজন্যেই বাল্যবিবাহ এখনো টিকে আছে। ১৯৮৫ সালের আদমশুমারী অনুসারে বাংলাদেশে ১০–১৪ বছর বয়সে মেয়েদের শতকরা ৭ ভাগ বিবাহিত, এবং ১৫–১৯ বছরের মেয়েদের শতকরা ৬৫ ভাগ বিবাহিত।

বিবাহের আচার-অনুষ্ঠানের দুটি বহুল প্রচলিত অঙ্গ হলো বধূপণ ও যৌতুক। ইংরেজিতে বধূপণকে বলে ব্রাইড-প্রাইজ। বিয়ের শর্ত হিসেবে

পারলে পরে দেয়া যেতে পারে এবং এক পুরুষে না দিতে পারলে পরপুরুষে পরিশোধ করতেই হবে।

আদিম সমাজগুলোতে বধূপণ প্রদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে বিয়েকে আইনগত অনুমোদন দেয়া। বধূপণ পুরোপুরি আদায় না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ সিদ্ধ হয় না। কোনো কোনো সমাজে বধূপণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত বধূ স্বামী গৃহে যায় না বরং বরকে শ্বশুরালয়ে বাস করতে হয়। স্ত্রী পরিত্যক্ত হলে কনের পিতা বরের পরিবারকে বধূপণ ফেরৎ দিতে বাধ্য থাকেন। স্ত্রী যদি সন্তান ধারণে অক্ষম হয় তাহলে কনের পিতাকে জামাতার জন্য অন্য একজন সন্তানবতী সরবরাহ করতে হয়। না করতে পারলে কনের পিতা বধূপণ ফেরৎ দিতে বাধ্য।

সুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপে কতিপয় উপজাতির মধ্যে দুই ধরনের বিয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়, বধূপণসহ বিয়ে এবং বধূপণ ছাড়া বিয়ে। বর যদি বধূপণ পুরোপুরি শোধ করতে পারে তাহলে স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের উপর সে পিতৃত্বের অধিকার পায় এবং সন্তান তার কর্তৃত্বে বাস করে। কিন্তু স্বামী যদি বধূপণ প্রাদানে ব্যর্থ হয় তাহলে সে সন্তানের উপরে কোনো অধিকার লাভ করে না ; তার ঔরসজাত সন্তান দাবি করতে পারে না। তার ঔরসজাত সন্তান স্ত্রীর গোত্রের সদস্যে পরিগণিত হয়।

বধূপণ প্রথা আধুনিক সমাজগুলোতে রহিত হয়ে গেছে। তবে ইসলামে যে মোহ্‌রানা দেবার ব্যবস্থা আছে তাকে বধূপণের সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা চলে। ইসলামে মোহর ছাড়া বিয়ে হতে পারে না। এমনকি মোহর প্রদানের কথাটি বিয়ের শর্তে উল্লেখ না থাকলেও মোহর দিতে হবে। সর্বনিম্ন মোহরের পরিমাণ পৌনে তিন তোলা রূপা, উর্ধে কোনো সীমা নির্ধারিত নেই। তবে মোহর কোনো অবস্থাতেই পৌণে তিন তোলা রূপার কম হতে পারে না।

যৌতুক কনের পিতা কর্তৃক বর বা বরের পরিবারকে প্রদেয় বাধ্যতামূলক উপঢৌকন। আমাদের দেশে যৌতুক দেবার রীতি ব্যাপক হারে প্রচলিত। যৌতুক বাকদানের পর থেকে বিয়ের প্রাক্কল পর্যন্ত দিতে

না পারলে পরেও দেয়া যেতে পারে। এর কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ নেই। যৌতুক হিসেবে টাকা ও অন্যান্য সামগ্রী যেমন জমি, বাড়ি, ঘড়ি, সাইকেল, রেডিও, টেলিভিশন, বা গবাদিপশু ইত্যাদি দেয়া হয়ে থাকে।

আগেই বলেছি যৌতুক আধুনিক সমাজের অভিশাপ। আমাদের সমাজে যৌতুক বিভীষিকার মতো, একটি সামাজিক ব্যাধির মতো পরিব্যাপ্ত। যৌতুক দেবার সামর্থ না থাকায় অনেক পিতা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন না ; অনেকে কন্যার বিয়েতে যৌতুক দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হন। অনেক ক্ষেত্রে কনের পিতা প্রতিশ্রুত যৌতুক প্রদানে ব্যর্থ হলে কনেকে পতিগৃহে দুর্ভোগ পোহাতে হয় এবং কখনো তা চরম আকার ধারণ করে, স্ত্রীকে নির্যাতনের শিকার হয়ে জীবন দিতে হয়। সংবাদপত্রে প্রায়ই খরব দেখা যায় যৌতুকের দাবি না মেটানোর ফলে স্বামীর হাতে স্ত্রী প্রহৃত ; স্বামীর হাতে স্ত্রী এসিড দগ্ধ, স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন। সম্প্রতি এমনি একটি ঘটনা ঘটেছে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার ডুবাইলঘটক পাড়ায়। এ গ্রামের বধূ ১৯ বছর বয়সী নাসিমা খাতুন স্বামীর প্রহারে খুন হয়েছে কারণ যৌতুকের দাবি মেটাতে পারেন নি তার বাবা। (দৈনিক সংবাদ, কার্তিক, ১৩৯২ সাল)।

যৌতুক প্রথা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যৌতুক নিষিদ্ধ আইন (Dowry Prohibition Act) প্রবর্তন করা হয়। এই আইনে যৌতুক গ্রহণ ও যৌতুক প্রদান—উভয়ই আইনত দণ্ডনীয়।

কিন্তু আইন করে যেমন বাল্যবিবাহ বন্ধ কর যায় নি ; তেমনি যৌতুক প্রথাও বন্ধ করা সম্ভব হয় নি। যৌতুক প্রথার বিভীষিকা থেকে তাই আজো এদেশ মুক্ত হয় নি।

বিয়েরভবিষ্যৎ

কবে কোথায় কি-ভাবে বিয়ের উৎপত্তি হয়েছিল. তা, সঠিক বলা যায় না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিয়ে একটি অতি সুপ্রাচীন প্রতিষ্ঠান। সমাজ বির্বতনের প্রথম ধাপই বিয়ের সূত্রপাত হয়েছিল বল্লে অত্যুক্তি হবে না।

আধুনিক দুনিয়ায় এমন কোনো সমাজ নেই যেখানে বিয়ের ব্যবস্থা নেই। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে যেসব উপজাতি তাদের সনাতন জীবন ব্যবস্থা আঁকড়ে ধরে আছে, তাদের মধ্যেও বিয়ের প্রচলন আছে। মোটকথা বিয়ে বিহীন উপজাতির সন্ধান নৃবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীরা খুঁজে পান নি।

হাজার হাজার বছর ধরে বিয়ে নামক যে প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে, তার ভবিষ্যৎ কি? প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে কি আরো হাজার বছর টিকে থাকবে? অদূর ভবিষ্যতে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটির বিলুপ্তির কোনো সম্ভাবনা আছে কি?

এ প্রশ্নের জবাব দেয়া দুরুহ। দেশ কাল পাত্র ভেদে পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়েছে ; তাদের মধ্যে অনেক প্রথা ও প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হয়ে গেছে ; আবার নতুন নতুন প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক বিশ্বে পাশ্চাত্যে পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর তৎপরতা প্রদর্শন করেছে। মধ্যযুগের পর থেকে পাশ্চাত্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অতি দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সেখানে মানুষের

ব্যক্তিগত জীবনও দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কোনো প্রথা বা প্রতিষ্ঠান উন্নতি ও অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক বিবেচিত হলে তাকে সমূলে উৎপাটন করতে পাশ্চাত্য দ্বিধা করে নি। পরিবর্তন প্রবণ পাশ্চাত্যে বিয়ের অবস্থান কি তা' বিশ্লেষণ করলে বিয়ের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

সত্তরের দশকে বিশ্ববিখ্যাত পত্রিকা লাইফ ম্যাগাজিন বিয়ে সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করেছিল। পশ্চিম বিশ্বের ইংরেজি ভাষা-ভাষী বাষট্টি হাজার নরনারী এই সমীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। তাদের প্রায় সবাই মত প্রকাশ করেছিল যে নানা বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও সময়ের বিবর্তনে মানুষ বিয়ের প্রয়োজনীয়তা আরো গভীরতরভাবে উপলব্ধি করবে এবং ভবিষ্যতে বিয়ের প্রতি মানুষের মনোভাব অধিকতর ইতিবাচক হয়ে ওঠবে। শত পরিবর্তনের মধ্যেও ধর্ম যেমন আজো বেঁচে আছে, তেমনি বেঁচে আছে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানটি ; কারণ বিয়ের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিভিন্ন অংশ গ্রহণকারী এই প্রয়োজন নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। কেউ কেউ বলেছেন, বিয়ে মানুষের মৌল মানবিক চাহিদাগুলো যেমন পূরণ করে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তেমনি পারে না। এ কথাটাই আগের অনেকে ঘুরিয়ে বলেছেন যে, অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বিয়ে থেকে মানুষ বেশি তৃপ্তি ও সুখ করতে পারে। কেউ কেউ বিয়ের উপযোগিতা বর্ণনা করতে গিয়ে ভাবপ্রবণ হয়েছেন। তারা বলেছেন, বিয়ের মাধ্যমে দুটি মানব সন্তান যেমন পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয় তেমনি অঙ্গীকার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারে না। বিয়ের অন্তর্নিহিত মর্ম এই যে ; একজন বিবাহিত মানুষ কেবল নিজের কথা ভাবে না ; নিজেকে ছাড়া অন্য একজনের কথাও সে ভাবে। যখন ক্ষমা দেয়া প্রয়োজন তখন সে ক্ষমা দিতে পারে ; রাগ হলেও সে হাসতে জানে ; আবার ক্রোধ শান্ত হলে যার প্রতি ক্রোধ হয়েছিল তার কাছে একান্তে এবং সর্বান্তকরণে নিজের মনোবেদনা ও হতাশা উজাড় করে দিতে পারে এবং পরিবর্তে সহানুভূতি ও সহমর্মিতা লাভ করে। একজন বিবাহিত মহিলা বলেছিলেন, "আমি জানি যে, আমার পরিবারের কাছে আমি

একজন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তি। এই অনুভূতির চাইতে বেশি আর আমার চাওয়ার কি আছে?" একজন কলেজের অবিবাহিত ছাত্র বলেছিলো, "আমার পিতামাতা যেমন পরস্পরকে নিঃস্বার্থেভাবে ভালবাসেন তেমনি নিঃস্বার্থ ভালবাসা উভয়েই আমাকে দিয়েছেন। একেই আমি বলি সফল বিবাহ এবং সে কারণেই আমি বিয়ে করতে চাই।"

যে সকল বিবাহিত দম্পতি বিয়ের প্রতি সদর্থক অভিমত ব্যক্ত করেছেন তারা সবাই নিজেদের বিবাহিত জীবনে সুখী বলে দাবি করেছেন। তবে মোট বিবাহিত দম্পতির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ নিজেদের "খুব সুখী" বলেছে। যারা খুব সুখী না বলে বেশ সুখী বলেছেন তারা মনে করেন বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা যত বেশি অভিজ্ঞ হবেন তত বেশি পরস্পরের নিকটতর হবেন এবং পঞ্চাশ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পারে তারা নিজেদের "খুব সুখী" বলার গর্ব অনুভব করবেন।

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের বক্তব্যের মধ্যে ভাবপ্রবণতার বিশেষ লক্ষ্য করা যায়। বিয়ের সঙ্গে মানুষের সংবেদনশীল মনের যে একটি গভীর যোগসূত্র আছে তা অস্বীকার করে লাভ নেই। বিয়ের যেমন একটি বাস্তব বা বস্তুবাদী দিক আছে। তেমনি একটি সংবেদনশীল বা মানবিক দিকও আছে।

বিয়ের প্রয়োজনীতা হ্রাস পাচ্ছে কি না তা অনুধাবন করতে হলে এই উভয় দিক বিশ্লেষণ করতে হবে। যে কারণগুলো মানুষকে বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট করে তাদের চারভাগে ভাগ করা যায় — নিরাপত্তা স্বীকৃতি, নবঅভিজ্ঞতা, এবং দান প্রতিদান। কারণগুলোর মধ্যে নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নব অভিজ্ঞতা ও দান প্রতিদানের আকাঙ্খা মানুষের সংবেদনশীল মনের বহিঃপ্রকাশ।

নিরাপত্তার কথায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রথমে আসে। আজকাল পাশ্চাত্যে মহিলা সমাজের একটি বিরাট অংশের নিজস্ব আয় উপার্জন আছে। আমাদের দেশেও মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে, পর্দার বাইরে আসতে শুরু করেছে এবং নিজেরা উপার্জন করতে পারছে। কিন্তু মাত্র কয়েকযুগ

আগেও মেয়েদের নিজস্ব উপার্জন বলতে কিছুই ছিল না ; ভরণ–পোষণের জন্য তারা ছিল সম্পূর্ণভাবে পরনির্ভরশীল। পুরুষের উপার্জনের ওপর তাদের বাঁচতে হতো। তাই প্রত্যেক মেয়ের জন্য বিবাহ ছিল আর্থিক নিরাপত্তার একমাত্র রক্ষাকবচ। পিতামাতা উপার্জনশীল বর খুঁজতেন ; মেয়েরাও একটা স্বামী পেলে বর্তে যেত। অরক্ষণীয়া রমণী ছিল সমাজের ভারস্বরূপ। অপরপক্ষে পুরুষের পক্ষে জীবিকার সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে নিজ নিজ ঘর গৃহস্থালীর কাজ নিজে নির্বাহ করা অসুবিধাজনক ছিল। সারাদিনের অর্থকরী কাজের পরে যদি নিজের হাতে রান্না করে খেতে হয় ; কাপড় চোপড় ধুতে হয়, ঘর সাজাতে হয় তাহলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে বই কি ! যাদের আর্থিক সামর্থ আছে তাদের পক্ষেও মাইনে করে লোক রাখার চেয়ে একটি সার্বক্ষণিক স্ত্রীর পরিচর্যা আর্থিক ও কৌশলগত দিক থেকে অনেক বেশি অভিপ্রেত। কালক্রমে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি শ্রমবিভাগের সৃষ্টি হয়েছিলো। এই ব্যবস্থায় নারীর স্থান হয়েছিলো অন্তঃপুরে। সে ঘর গৃহস্থালীর কাজ করবে ; রান্নাবান্না করবে ; সন্তান পালন করবে, ঘরের যাবতীয় কাজ করবে। পুরুষে ঘরের বাইরে অর্থ উপার্জনের কাজে নিয়োজিত হবে। সে কৃষিকাজ করবে, কলকারখানায় অফিস আদালতে শ্রম দেবে, ব্যবসা–বাণিজ্য করবে। সে হবে সংসারে রুটি রুজির মালিক। সমাজ স্বীকৃত এই শ্রমবিভাগের অত্যাবশ্যক আনুষঙ্গিক বিবাহ ব্যবস্থা। নারীর পরনির্ভরশীলতা ও পুরুষের গৃহস্থালীর প্রয়োজন মেটাতে বিয়ের জুড়ি পাওয়া ভার। নারীপুরুষের সমাজ নির্ধারিত শ্রম বিভাগ আজকের জগতে দ্রুত পুনর্বিন্যাস ও পুনর্মূল্যায়নের সম্মুখীন হয়েছে। এখন পশ্চিমা জগতে অনেক মহিলাই নিজের আয় দিয়ে নিজের ভরণপোষণ চালাতে পারে। অপরপক্ষে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ঘর গৃহস্থালীর কাজ সহজ হয়ে এসেছে এবং নিজের ঘর গৃহস্থালীর জন্য পর্যাপ্ত সময় পুরুষের হাতে থাকছে। কাজেই অতীতের নারীপুরুষের শ্রমবিভাগ আজ অনেক ক্ষেত্রেই অচল ও অবাস্তব। নারী ও পুরুষ একে অপরের সহায়তা ছাড়া অনায়াসে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কেউ

কারও মুখাপেক্ষী না হয়েও আর্থিক নিরাপত্তা ভোগ করতে পারে। কাজেই আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বিয়ের উপযোগিতা হ্রাস পাবার কথা। তবে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে একজন নারী ও পুরুষ যদি দুজনের আয় মিলায় তবে অনেক কম খরচে এবং অনেক বেশি বস্তুগত আরাম আয়েসে জীবন কাটাতে পারে। অর্থাৎ বিবাহ আর্থিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করে। অর্থনীতির ভাষায়, বিবাহ সম্পদের অধিকতর উৎপাদনশীল ও সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে।

আর্থিক নিরাপত্তা মানুষের সব নয়। এ ছাড়াও একজন মানুষ নানাবিধ নিরাপত্তা যাচ্ঞা করে। মানুষ, সে নারী হোক বা পুরুষ হোক, বিপদে–আপাদে, রোগ–ব্যাধিতে, দ্বিধাগ্রস্থ সিদ্ধান্ত গ্রহণে একাকী অসহায় বোধ করে। তখন সে একজন সমব্যথী, সহানুভূতিশীল দোসর খোঁজে। সবচেয়ে বেশি অনিরাপত্তা বোধ মানুষের আসে বৃদ্ধত্বের চিন্তা থেকে। বৃদ্ধ বয়সের একটি অবলম্বন মানুষপূর্বাহ্নে স্থির করে রাখতে চায়। পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই সন্তানকে বৃদ্ধত্ব বিমারূপে গণ্য হতে দেখা যায়। কৃষক বুড়ো হলে জমি চষতে পারবে না ; তার জমিকে চষবে কে তার জমি চষে তার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে? মিলশ্রমিক যদি দুর্ঘটনায় কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলে স্ত্রী ও সন্তান ছাড়া কে তাকে দেখবে? ইত্যকার কারণে মানুষ নিরাপত্তা খোঁজে এবং বিয়ের মাধ্যমে সে নিরাপত্তা নিশ্চিত করার আশা পোষণ করে।

আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে জনগণের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের দায়িত্ব রাষ্ট্রের বলে ধারণা করা হয়। বিলেতে একজন নাগরিকের জন্ম থেকে বৃদ্ধত্ব পর্যন্ত রোগব্যাধিতে চিকিৎসা ও শুশ্রূষার দায়িত্ব সরকার বহন করে। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য ধনী রাষ্ট্রে চিকিৎসা ও বৃদ্ধত্ব বিমার ব্যবস্থা আছে ; সরকারি অর্থে বৃদ্ধদের জন্য আশ্রমের সংস্থান আছে। কর্ম–ক্ষমতা হারালে বা বৃদ্ধ হয়ে কর্ম থেকে অবসর নিলে তার ভরণপোষণের বিশদ ব্যবস্থা রাষ্ট্র বিধান করে থাকে। কাজেই সামাজিক নিরাপত্তার জন্য বিবাহ পাশ্চাত্যে ততটা অপরিহার্য নয়।

তবে হাসপাতাল বা বৃদ্ধাশ্রম নিজের বাড়ি নয়, মানুষ তার জীবনের অধিকাংশ সময় নিজ গৃহের আন্তরিক পরিবেশে কাটায় ; এই পরিবেশ ছেড়ে হাসপাতাল বা আশ্রমে জীবন কাটানোর সম্ভবনা কখনই সুখকর নয়। তাছাড়া সেবা বা মমত্ববোধ বলতে মানুষ যা চায় হাসপাতালে বা বৃদ্ধাশ্রমে সে ধরনের নিরাপদ আশ্রয় মেলে না। দেবদাসের উপন্যাসে পার্বতীর সাথে মিলনে বঞ্চিত দেবদাসের মৃত্যুপ্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র এই সত্যের প্রতিধ্বনি করেছেন, "যদি কখনও দেবদাসের মতো এমন হতভাগ্য, অসংযমী পাপিষ্ঠের সহিত পরিচয় ঘটে, তাহার জন্য প্রার্থনা করিও। প্রার্থনা করিও, আর যাহাই হোক যেন তাহার মতো এমন করিয়া কাহারও মৃত্যু না ঘটে ! মরণে ক্ষতি নাই, কিন্তু সে সময় যেন একটি স্নেহ-কর স্পর্শ তাহার ললাটে পৌছে—যেন একটিও করুণার্দ্রে স্নেহময় মুখ দেখিতে দেখিতে এ জীবনের অন্ত হয়। মরিবার সময় যেন কাহারও এক ফোঁটা চোখের জল দেখিয়া সে মরিতে পারে।" মানুষের এই চিরন্তনী বাসনা একমাত্র বিবাহের মাধ্যমে পরিপূর্ণ হতে পারে।

বিয়ের প্রতি আর্কষণের আর একটি কারণ সামাজিক স্বীকৃতি লাভের ইচ্ছা। মানুষ সমাজে দশজনের একজন হয়ে বাঁচতে চায় এবং আত্নীয় পরিজন বন্ধু-বান্ধব পরিবৃত হয়ে জীবন কাটাতে চায়। অন্য দশজনের থেকে সে আলাদা প্রতিপন্ন হতে চায় না। তাই সমাজে আর দশজন যেমন বিয়ে করে তারও তেমনি বিয়ে করে ঘর সংসার পাতার ইচ্ছা হয়। মনে করা যাক তিন বন্ধু শৈশব থেকে এক সাথে বেড়ে উঠেছে, তাদের বন্ধুত্ব কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পৌছে গেছে। এখন দুই বন্ধু বিয়ে করলো এবং এক বন্ধু একাকী জীবন যাপন করতে লাগলো। স্বভাবতঃই দেখা যাবে যে বিবাহিত দুই বন্ধু অবিবাহিত বন্ধুর কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। তাদের সম্পর্কের মধ্যে যেন একটা আড়াল সৃষ্টি হচ্ছে। বিবাহিত দুই বন্ধু পরিবারের মধ্যে যেমন মেলামেশা, অন্তরঙ্গতা, ও ঘনিষ্ঠত তৃতীয় বন্ধুর সঙ্গে তেমন সম্পর্ক গড়ে ওঠছে না। এই পরিস্থিতিতে তৃতীয় বন্ধু বিবাহের জন্য আকাঙ্খিত হতে বাধ্য। আমাদের সমাজে বিবাহ এমন একটি নিত্য

নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যে যারা বিয়ে না করে আজীবন কুমার বা কুমারী থাকে তারা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়, তারা কখনও করুণা আবার কখনো পরিহাসের পাত্রপাত্রী হয়। কুমার-কুমারী থাকাকে সমাজে ব্যক্তিগত অক্ষমতা হিসেবে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা হয়। সমাজে যাতে অনভিপ্রেত ব্যতিক্রম হিসেবে চিহ্নিত হতে না হয় তাই নারী পুরুষ বিয়ে করে। নিজেদের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ প্রমাণ করতে যায়।

শুধু ইহজন্মে নয়, মৃত্যুর পরেও মানুষ স্বীকৃতি চায়। মানুষ সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়। সন্তান তার নাম বহন করবে এবং তার নামে পরিচয় দেবে, মৃত্যুর পরে সন্তান তার পারলৌকিক আচার-অনুষ্ঠান করবে। এভাবে প্রত্যেক মানুষ নিজের পরিচয় রেখে যেতে চায়। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার নাম নিশানা মুছে যাক, এ ভবিতব্য কোনো মানুষ খুশিমনে গ্রহণ করতে পারে না। তাই মানুষের মধ্যে বিয়ে করার এবং বৈবাহিক জীবনে সন্তানের আইনানুগ মাতা বা পিতার মর্যাদালাভের আকাঙ্খা জন্মায়। এই আকাঙ্ক্ষাকে রূপদানের জন্য মানুষ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

সমাজের একজন সদস্য হিসেবে মানুষ নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি চায়। উপরন্তু মানুষের একটি সংবেদনশীল মন এবং ভাবাবেগ আছে। মানুষের এই ভাবময় সংবেদনশীল মন তাকে বিয়ের অভিজ্ঞতার প্রতি আকৃষ্ট করে। নবঅভিজ্ঞতার টানে মানুষ বিয়ে করে। শিশু জন্মের পরে পিতামাতার ঘরে মানুষ হয় । বড় হয়ে ছেলে মেয়েরা ভাইবোন পিতামাতা নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে এক পরিবারে এক গৃহে একত্রে বসবাস করে, এই জীবনে কোনো যৌনতা থাকে না। কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করে যুবক-যুবতী এই অযৌন জীবনের অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট হয় না। তারা একজন বিপরীত লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার স্বপ্ন দেখে। একজন যুবক একজন যুবতীর এবং একজন যুবতী একজন যুবকের সঙ্গে একত্র বসবাসের অভিজ্ঞতা আস্বাদ করতে ব্যাকুলতা অনুভব করে। এই নতুন অভিজ্ঞতার মধ্যে অবশ্য মানুষের চিরায়ত যৌন প্রকৃতি প্রধান ভূমিকা

পালন করে। পিতামাতা ও ভাইবোনের সঙ্গে পুরাতন জীবনের অভিজ্ঞতা একঘেয়ে বোধ হয়। একজন অনাত্মীয় নারী বা পুরুষের সঙ্গে একত্রে বাস করবে, তার সঙ্গে যৌনজীবন ভোগ করবে ; যে শয্যায় সে এতোকাল রাত্রি যাপন করেছে সেখানে তার একজন সাথী জুটবে — এই নতুন অভিজ্ঞতার সম্ভাবনা তার মনকে প্রবলভাবে নাড়া দিতে থাকে। নতুন অভিজ্ঞতাকে বাস্তবে রূপদানের জন্য সে বিয়ে করতে আগ্রহী হয়।

বিয়ে না করে যে যৌনজীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করা যায় না তা হয়ত নয়। দুটি নরনারী বিয়ে না করেও একত্রে বসবাস করতে পারে এবং বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে একত্র বাসের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পারে। পাশ্চাত্যে সম্প্রতি তরুণ-তরুণীর মধ্যে বিয়ে না করে একত্রে বসবাসের প্রবণতা দেখা যায়। কিছু কিছু নরনারী বিয়ে করে না কিন্তু একত্রে বসবাস করে এবং যৌনজীবন ভোগ করে। একগামী স্বামী-স্ত্রীর মতো তারা পরস্পর নিবিড় সান্নিধ্যে অঙ্গীকারবদ্ধ জীবন যাপন করে। তারা একসঙ্গে ঘর সংসার করে, গৃহস্থালী নির্বাহ করে। তারা বিবাহিত দম্পত্তির মতো তাদের যৌন অভিজ্ঞতা নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে, নিজেদের বাইরে যৌন বৈচিত্র্য খোঁজে না। তারা অবিবাহিত তরুণ তরুণীদের মতো অপরের সঙ্গে মেলামেশা করে না, বরং সাথিকে অন্য কারো সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে দেখলে ঈর্ষাবোধ করে। এ ধরনের অবিবাহিত যৌনজীবন নিয়ে নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়েছে। অধিকাংশ নৃতত্ত্ববিদ এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, পাশ্চাত্যে প্রচলিত বিবাহ বিহীন একত্রবাস বস্তুত বিবাহেরেই নামান্তর ; প্রভেদ শুধু এই যে, আনুষ্ঠানিক বিবাহে নারী ও পুরুষ গির্জায় গিয়ে নিজেদের স্বামীস্ত্রীরূপে ঘোষণা দেয় বা বিবাহ আদালতে গিয়ে দলিলে সই করে। এই পার্থক্য বাদ দিলে বিবাহবিহীন বসবাসকারী নারী ও পুরুষ এবং একজোড়া বিবাহিত দম্পতির জীবন যাপন প্রণালিতে কোনো ইতর বিশেষ নেই। বরং দেখা গেছে যে, যারা বিয়ে না করে একত্রে বাস করে, কালক্রমে তারা বিয়ের খাতায় নাম লেখায়। স্কাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে তরুণ-তরুণীর মধ্যে বিয়ে না করে একসঙ্গে

বসবাস করার বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে দুই বা তিন বছর কিংবা একটা সঙ্গত সময় একত্র জীবন যাপনে অভ্যস্থ হয়ে ওঠলে এবং বনিবনা হলে তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়। আজীবন বিবাহবিহীন জীবন যাপন করছে এমন প্রবীণ নারী ও পুরুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

প্রসঙ্গত ঐ কলেজ ছাত্রের কথা পুনরুল্লেখ করা য়ায়, যে বিয়ের ব্যাপারে তারা পিতামাতাকে অনুসরণ করতে চেয়েছিল। প্রচলিত বিবাহ ব্যবস্থায় সন্তান পিতামাতার নিকট সান্নিধ্যে বড় হয়। সে পিতামাতার মধুর সম্পর্ক পদে পদে অনুভব করে। যৌবনে পদার্পণ করতে তার মনে পিতামাতার বিবাহিত জীবনের মধুর চিত্র অঙ্কিত হয়ে যায় এবং তার চিত্তে দাম্পত্যজীবন গভীর রেখাপাত করে। যখন সে তার যৌনজীবনের কথা ভাবতে শুরু করে তখন তার সামনে তার পিতামাতার দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতাই সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে ওঠে। সে ঐ রূপ জীবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তার বাবা মা যেমন বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জীবনকে সুন্দর করে তুলেছিলেন, তাকে সুন্দরভাবে মানুষ করেছিলেন, সেও বিয়ে করে নিজের জীবনকে তেমন সুন্দরভাবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে। আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় এভাবে বিয়ের প্রক্রিয়াপিতামাতা থেকে সন্তানে আবর্তিত হয়। পিতামাতাকে দেখে সন্তান বিয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং বিয়ে করে, তার সন্তানরা আবার তার কাছে থেকে অভিজ্ঞতার পাঠ পায়। এভাবে বিয়ের প্রতি আকাঙ্খা ও আকর্ষণ এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে প্রবহমান নদীর মতো প্রবাহিত হয়। জীবনের প্রবাহ মানুষকে এভাবে বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠানকে আঁকড়ে ধরে থাকতে উৎসাহিত করে।

নারী পুরুষের যৌনজীবনের নতুন অভিজ্ঞতা যখন একজোড়া তরুণ–তরুণীকে কাছে টানে তখন তারা পৃথিবীর সকল তরুণ–তরুণী থেকে পৃথক হয়ে পড়ে। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি মানুষের আকর্ষণ তখন একজন নির্দিষ্ট পুরুষের একজন নির্দিষ্ট নারীর প্রতি এবং একজন নির্দিষ্ট নারীর একজন নির্দিষ্ট পুরুষের প্রতি আকর্ষণ দানা বাঁধে। একজোড়া নারী ও পুরুষের

পরস্পরের প্রতি এই বিশেষ আকর্ষণকে আমরা বলতে পারি ভালোবাসা বা প্রেম। বিয়েতে নারী পুরুষ এই পারস্পরিক ভালোবাসা কামনা করে। একজন তার সাথীকে প্রেম নিবেদন করবে, অপরজন প্রেমের প্রতিদান দেবে, — এই দান প্রতিদান, এই মন দেয়ানেয়া বিয়ের ভিত্তি রচনা করে। পরস্পরের প্রেমে বিলীন হয়ে একদেহ একমন একপ্রাণে পরিণত হওয়ার মধ্যে বিয়ের পরিপূর্ণতা, বিয়ের সফল বাস্তবায়ন। "তুমি আমার আমি তোমার" স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে এমনি ভাবের উদয় হয়। স্বামী ভাবে, এমন একজন আছে যে তার জন্য ভাবে, আবার সেই এমন একজনের জন্য ভাবতে তার নিজেরও ভালো লাগে। স্ত্রীর মনেও অনুরূপ ভাবের সঞ্চার হয়। এই ভাবাভাবি পরস্পরের মধ্যে অলৌকিক পুলক ছড়িয়ে দেয়। স্বামীর সমগ্র অন্তর জুড়ে থাকে স্ত্রী, স্ত্রীর সমগ্র জুড়ে থাকে স্বামী। মানুষের নানা ক্ষুদ্রতা, অক্ষমতা থাকে, কেউই সম্পূর্ণ নিখুঁত বা সর্বাঙ্গ সুন্দর নয়। এসব ক্ষুদ্রতা ও অক্ষমতা সত্ত্বেও একজন হৃদয় উজাড় করে দেবে — এই অনুভূতি থেকে বিয়ের বাসনা জন্ম নেয়।

নারী পুরুষের মন দেয়া নেয়ার যে মধুর সম্পর্ক ব্যক্ত করা হলো তাকে রোমান্স বলা যায়। রোমান্সের সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। বিয়ের অব্যবহিত পূর্বে এবং বিয়ের পরে কিছুকাল সকল তরুণ–তরুণী অবশ্যই রোমান্সকর হয়। রোমান্স প্রেম বিয়ের আগেই শুরু হতে পারে কিনা সে সম্পর্কে বিভিন্ন সমাজ বিভিন্ন মত পোষণ করে থাকে। আজকের পাশ্চাত্য জগতে বিয়ের আগে প্রেমের সূচনা হয়। প্রেম করে, মন দেয়া নেয়ার পরে বিবাহ সংঘটিত হওয়াই রেওয়াজ। তবে এ ব্যবস্থাও পাশ্চাত্যে অপেক্ষাকৃত নবীন বলা চলে। বিয়ের আগের রোমান্টিক প্রেম ইউরোপে এককালে আমল পায় নি। শেক্সপীয়রের কাব্য থেকে উদাহরণ টানা চলে। রোমিও ও জুলিয়েটের ভালোবাসা বিয়েতে পূর্ণতা পায় নি, দুটি প্রাণ অকালে ঝরে গিয়েছিলো। তার কারণ জুলিয়েটের পিতা এ প্রেম স্বীকার করে দুজনের বিয়ে দিতে রাজি হন নি। তিনি কন্যাকে জোর করে অন্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। মার্চেন্ট অব ভেনিসের নায়িকা

পোর্শিয়া ইচ্ছা করলেই মনের মানুষকে বিয়ে করতে পারত না। তার বাবা মৃত্যুর আগে দানপত্রে স্পষ্টভাবে লিখে গিয়েছিলেন যে, পোর্শিয়া ইচ্ছা করলেই যাকে তাকে বিয়ে করতে পারবে না। তিনটি মঞ্জুষা থাকবে। তার একটি সোনার তৈরি একটি রুপোর, আর একটি সীসার। তার একটার মধ্যে থাকবে পোর্শিয়ার ছবি। যে পাণিপ্রার্থী বলতে পারবে কোন মঞ্জুষায় পোর্শিয়ায় ছবি আছে, সেই পোর্শিয়ার পাণিগ্রহণ করতে পারবে।

প্রাচ্য দেশগুলোতে বিয়ের পূর্বে রোমান্স গ্রাহ্য নয়। বিয়ের পরে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে অনুগত থাকবে এবং পরস্পরে দেহমন সপে দেবে, কিন্তু বিয়ের আগে তাদের পরিচয় হতে পারবে না। আমাদের দেশে অতীতে নরনারীর বিয়ে সাধারণত ঘটকের মাধ্যমে স্থিরীকৃত হতো, পাত্রপাত্রী নির্বাচনে পিতা-মাতার বংশমর্যাদা, ও আর্থিক স্বাচ্ছল্যই ছিল প্রধান বিচার্য, বিবাহযোগ্য তরুণ-তরুণীর পছন্দের কোনো মূল্য ছিল না। এককালে এদেশে কৌলিন্য-প্রথা বিভীষিকার সৃষ্টি করেছিল। 'আলালের ঘরের দুলাল থেকে উদ্ধৃতি দেয়া যায়। "বাবুরাম বাবু বনরাম ঠাকুরের সন্তান, এজন্য জাতি রক্ষার্থে কন্যাদ্বয় জন্মিবামাত্র বিস্তর ব্যয় ভূষণ করিয়া তাহাদের বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু জামাতার কুলীন, অনেক স্থানে দার পরিগ্রহ করিয়াছিল — বিশেষ পারিতোষিক না পাইলে বৈদ্যবাটির শ্বশুর বাটিতে উঁকিও মারিত না।" কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতোম প্যাঁচার নকশায় কুলীন স্বামীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এক একজন কুলীন এত গুলো বিবাহ করতে যে, তার হিসেব রাখা সম্ভব ছিল না। তাই একটা খেরো খাতা সব শ্বশুরবাড়ির ঠিকানা লিখে রাখতে হতো এবং পর্যায়ক্রমে শ্বশুর বাড়ি গিয়ে জামাই বিদায় নিত। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রখ্যাত উপন্যাস চন্দ্রশেখরে প্রতাপ কেবলমাত্র জ্ঞাতি সম্পর্কের কারণে শৈবালিনীকে বিয়ে করতে পারে নি, নিজের ভালোবাসার মূল্য দিতে গিয়ে সে জীবন বিসর্জন দিয়েছিল।

এদেশে মুসলমান সমাজে পর্দার কড়াকড়ি এক সময় চরমে উঠেছিলো। একজন রমণীর মুখ পর পুরুষ তো দূরের কথা অপরিচিত

কোনো রমণীর পক্ষে দেখাও নিষিদ্ধ হয়েছিল। কাজেই বিয়ের আগে মুসলমান ছেলেমেয়ের পরিচয় বা মন দেয়া নেয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল। প্রথম বাঙালি মুসলমান মহিয়সী মহিলা, বেগম রোকেয়া অবরোধবাসিনী গ্রন্থে যেসব উদাহরণ দিয়েছেন তা থেকে দুটো উদ্ধৃত করা যাক। এক জমিদার বাড়িতে তিন মেয়ের একই দিনে বিয়ে দেয়া হয়েছিল। বর কনে কেউ কাউকে কখনো দেখে নি। কাজি সাহেব এক আসরে তিনটি বিয়ে পড়াতে গিয়ে সব গোলমাল করে ফেলেছিলেন। ফলে যার বিয়ে ঠিক হয়েছিল তার সঙ্গে তার বিয়ে না দিয়ে ওলট-পালট বিয়ে দিয়েছিলেন। এক জমিদার কন্যার বিয়ে একজন সুপাত্রের সঙ্গে স্থির হয়েছিল, কিন্তু দেনাপাওনা নিয়ে বিরোধের ফলে বিয়ে ভেঙে যায়। তখন মেয়ের অভিভাবক তার এক চরিত্রহীন ভ্রাতুস্পুত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। মেয়েটি ঐ ভ্রাতুস্পুত্রের জঘন্য চরিত্র সম্পর্কে অবহিত ছিল। কিন্তু বিয়েতে বাধা দেবার তার শক্তি ছিল না। জোর করে তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছিল। লুৎফর রহমানের রায়হান উপন্যাসে আমিনার ভাই আমিনার সঙ্গে মজিদের বিয়ে দিয়ে জাত খোয়াতে অস্বীকার করছিল। কারণ মজিদ ছিল চাষার ছেলে। এনায়েত আলি অশিক্ষিত হলেও উচ্চবংশের ছেলে, তার সঙ্গে আমেনার বিয়ে দিলে তার ভাই এর সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তাই প্রবঞ্চনার আশ্রয় নিয়ে আমিনার বিয়ে দেয়া হয়েছিল এনায়েত আলির সঙ্গে। এই বিয়ের পরিণামে আমেনাকে দুঃসহ কষ্টভোগ করতে হয়েছিল।

এখন অবশ্য পর্দাপ্রথা অনেকটা শিথিল হয়েছে। ফলে দুটি একটি করে প্রেমের বিয়ে সংগঠিত হচ্ছে। একথা বলা সঙ্গত হবে না যে, বিয়ের রোমান্সের প্রতি এ দেশের সাধারণ জনমনে উচ্চধারণা রয়েছে। লায়লী মজনু, শিরি-ফরহাদ, সাইফুল ইসলাম বদিউজ্জামান, আনারকলি জাহাঙ্গীর প্রভৃতি প্রেমের উপাখ্যান আজো শ্রদ্ধাভরে পঠিত হয়। চলচ্চিত্র এখন সবচেয়ে জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম। আমাদের চলচিত্রে নারী-পুরুষের প্রাক বিবাহ প্রেম স্থিতি পেয়েছে। চলচ্চিত্র কাহিনীতে একটি স্থির

প্যাটার্ন পরিলক্ষিত হয়। একজোড়া তরুণ-তরুণীর মাধ্যমে প্রেমে হয়, মন দেয়া-নেয়া হয়। কিন্তু এই প্রেমের বিয়ে স্বাভাবিক পরিণতি লাভের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে অবশেষে দুটি তরুণ-তরুণী তাদের ঈপ্সিত লক্ষ্যে উপনীত হয়। তাদের মিলনের পথে সকল প্রতিবন্ধক ঘুচে গিয়ে তাদের বিয়ে হয়। দর্শকমণ্ডলী করতালি দিয়ে প্রেমের ঐ সুখকর পরিণতিকে অনুমোদন ও অভিনন্দন দেয়। ছবির কাহিনীর প্রতি সমর্থন যদি দর্শকের মনের কথা হয় তবে ধরে নিতে হবে যে আমাদের সমাজে প্রেমের বিয়ের প্রতি জনগণের আকর্ষণ ও অনুমোদন উভয়ই আছে। তবে কাহিনীর জগতে যা সাবলীল, বাস্তব জীবনে তার সকল প্রয়োগ তত সহজ নয়। তাই আমাদের সমাজে প্রেমের বিয়ে যদিও ক্রমেই স্বীকৃতি পাচ্ছে, তবে এখনো সমাজ দ্বিধামুক্ত হয় নি। বাংলাদেশের সমাজে এখনো পিতামাতা সন্তানের বিবাহ স্থির করেন এবং এ ব্যাপারে তরুণ-তরুণের পারস্পরিক পরিচয় ও বাসনা মুখ্য বিচার্য হিসেবে বিবেচিত হয় না। তবে যদি একজোড়া তরুণ-তরুণীর মধ্যে মন দেয়া নেয়া হয় তাহলে পিতামাতা প্রেমিক প্রেমিকার ইচ্ছাকে মর্যাদা দিতে খুব কুণ্ঠিত হন না।

প্রেমের বিয়ে হোক বা পিতামাতার দেয়া বিয়ে হোক, সকল তরুণ-তরুণী রোমান্টিসিজম নিয়ে বিয়ের মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যৎ জীবনসাথীকে নিয়ে তারা স্বপ্নের বাসর গড়ে তোলে। যার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে তার সঙ্গে হয়ত পরিচয়ের সুযোগ হয় নি, হয়ত দুজনের মধ্যে চাক্ষুস দেখা সাক্ষাতও হয় নি, হয়ত দুজনের কেউ কাউকে চেনে না, কিন্তু এই অপরিচিত রোমান্সের স্বপ্নরাজ্য রচনায় বাধা সৃষ্টি করে না। বিয়ের আসরে যখন সবাই আনুষ্ঠানিকতা নিয়ে ব্যস্ত তখন পাত্রপাত্রীর দেহ মাত্র থাকে আসরে, মন তাদের রোমান্সের ফানুস উড়িয়ে স্বপ্নরাজ্যে উড়ে যায়। অপরিচিতের বাধা ডিঙিয়ে তারা পরস্পর প্রেমের বন্ধনে একাত্ম হয়ে আকাশ-কুসুমে গড়ে তোলে। যখন তরুণ-তরুণী বাসর ঘরে প্রবেশ করে তার আগেই

তাদের মধ্যে স্বপ্নের মিলন সংঘটিত হয়ে যায়, এক দেহে লীন হয়ে তারা রূপকথার রাজ্যে বিচরণ করে দেয়।

রোমান্সের এই আবেশ, এই অবাস্তব কপোল কল্পিত ইন্দ্রজাল তাদের সংসার থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তাদের কাছে তখন "সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব, কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।"

রোমান্সের স্বপ্নজগতে যদি আমরণ বিচরণ করা যেত তাহলে জীবন কত না সুন্দর হতো। কিন্তু জীবন স্বপ্ন নয়, সংসার বড় কঠিন স্থান। সকল দম্পতিকেই একদিন স্বপ্নের ভুবন থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে আসতে হয় ; সংসারের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। যে বিয়ে তাদের মধ্যে ফুল হয়ে ফুটেছিল, সে ফুল যে কাঁটাও আছে তা তাদের একদিন হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। প্রীতিপ্রদ ভাবময় জগৎ থেকে নেমে এসে সমস্যাসংকুল সংসারের টানা পোড়েন মিশে যাওয়া সহজ নয়!

যতদিন তারা মধুচন্দ্রিমায় থাকে ততদিন তরুণ-তরুণী কেউ কারো দোষ দেখতে পায় না, প্রত্যেক অপরের কাছে বড় হতে চায়, নিজেকে অপরের কাছে ওপরে তুলে ধরতে চায়। কিন্তু মধুচন্দ্রিমা শেষে কর্মজীবনে ফিরে এলে সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে নানা ত্রুটিবিচ্যুতি বেরিয়ে পড়ে। এখানে একটি ইংরেজি ছোটগল্পের উদাহরণ দিলে বিষয়টি বিশদ হবে। স্বামী বার্নি ট্রাকচালক। সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল এবং সত্যিই স্ত্রীকে হৃদয় দিয়ে ভালোবাসত, মধুচন্দ্রিমা থেকে ফিরে সে কাজে যোগ দিল। ট্রাকচালককে বেশ পরিশ্রম করতে হয়। যখন সারা দিনের খাটুনির পরে বার্নি ঘরে ফেরে তখন সে ক্ষুধার্ত। তাছাড়া সে খেতে পছন্দও করে। তার স্ত্রী একটু ভাবপ্রবণ। তার মধ্যে বিয়ের রোমান্স মধুচন্দ্রিমার সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়নি। জীবনকে সুন্দর ও মোহময় করাই তার বাসনা। তাই একদিন বার্নি কাজে গেলে সে গৃহটিকে সুসজ্জিত করতে মনস্থ করলো। সে খাওয়ার টেবিলে নতুন চাদর বিছাল, সবচেয়ে ভালো কাটাচামচ সাজিয়ে দিল, দরদ দিয়ে রাঁধল। আরো একটু রোমান্টিক

হওয়ার জন্য সে একগুচ্ছ সুন্দর ফুল কিনে খাওয়ার টেবিলে সাজিয়ে দিল। তারপর শুরু হলো স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা।

স্বামী যখন ফিরলো তখন সে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত। সাজানো টেবিলে পেয়ে সে খেতে বসে গেল, স্ত্রী যে-নতুন ভাবময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তা তার চোখ এড়িয়ে গেল। ফুল নিয়ে সে কোনো কবিত্ব করলো না, একমনে খেয়ে গেলো। স্ত্রীর মন প্রতীক্ষিত সাড়া না পেয়ে হোঁচট খেলো। খাওয়া শেষ হলে হতাশ স্ত্রী বার্নিকে জিজ্ঞাসা করলো, সে ফুল পছন্দ করে কিনা। স্ত্রীর প্রশ্নে বার্নির প্রথমবারের মতো নজরে পড়লো যে টেবিলে সাজানো ফুল আছে। এ পরিস্থিতিতে স্ত্রীর চোখে পানি আসা অস্বাভাবিক নয়।

বার্নি কিভাবে সংকট কাটিয়ে উঠেছিলো গল্পকার তা বলেন নি। তবে অধিকাংশ দম্পতিই সংসারের এসব সংকট কাটিয়ে ওঠে। প্রায় সকল নারী পুরুষ বাস্তব জীবনের চাহিদার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়, জীবনের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি মেনে নিয়ে বিবাহিত জীবনকে পারস্পরিক সমঝোতা ও সহমর্মিতা দিয়ে ভরে দেয়। বিবাহ তখন সার্থক ও চিরস্থায়ী হয়।

তবে কেউ কেউ বাস্তবতার সঙ্গে সন্ধি করতে পারে না। তখন স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ঠোকাঠুকি বেঁধে বিয়ে ভেঙে যায়। বিবাহ বিচ্ছেদ ডিভোর্স বা তালাক বিয়ের প্রসঙ্গ একটি অনভিপ্রেত বাস্তবতা। কোনো দম্পতিই বিয়ের আগে বা মধুচন্দ্রিমায় বিয়ে ক্ষণস্থায়ীত্বের কথা ভাবতে পারে না। তবু বিয়ে ভাঙে, ডিভোর্স হয়, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তালাক ঘটে। পাশ্চাত্যে ডিভোর্সের সংখ্যা অধুনা বৃদ্ধি পেয়েছে। কোনো কোনো অঞ্চলে পঁচিশ থেকে পঁয়ত্রিশ শতাংশ বিবাহ ডিভোর্সে শেষ হতে দেখা গেছে। আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে মোট বিবাহিত নারী পুরুষের তুলনায় তালাকপ্রাপ্তা নারীপুরুষের সংখ্যা ১৯৬১ সালে ০.৮১ শতাংশ, ১৯৭৪ সালে ০.৯৪ শতাংশ এবং ১৯৮১ সালে ০.৯৩ শতাংশ। পাশ্চাত্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশে ডিভোর্সের হার অতি নগণ্য।

কি কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় তা এক কথায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যে বিবাহ বিচ্ছেদ খুবই সহজ। এসব কারণে সেখানে বিয়ে ভেঙে যায় তার মধ্যে অনেকগুলো নিতান্ত অকিঞ্চিতকর বলে প্রতীয়মান হয়। একজন স্ত্রী অভিযোগ করেন যে, স্বামী স্ত্রীর পোষা বিড়ালটিকে তাদের শয্যায় শুতে দিতে আপত্তি করেন। এই অভিযোগ আদালত স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিয়েছিল। কারণ যাই হোক, বিবাহ বিচ্ছেদকে বিবাহ ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত হিসেবে ত্রুটি গণ্য করা চলে না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডিভোর্সের পরে তালাকপ্রাপ্ত নরনারী আবার অন্যত্র বিয়ে করে এবং নতুন করে বিবাহিত জীবন শুরু করে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে যুক্তরাষ্ট্রে তালাকপ্রাপ্ত নারীপুরুষের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ থেকে চার-পঞ্চমাংশ পুনরায় বিয়ে করে সংসার পাতে।

বিবাহ বিচ্ছেদের ক্রমবর্ধমান হার কিন্তু সক্ষম যুবক-যুবতীকে বিবাহ থেকে নিরুৎসাহিত করতে পারে নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পাশ্চাত্যে বিয়ের হার বেড়েই চলেছে। ১৯৬৩ সালের পরে এই হার অতিদ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭০ সালে অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যায়।

কাজেই ডিভোর্সের ক্রমবর্ধমান প্রবণতাকে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটির ক্রম অবলুপ্তির লক্ষণ বিবেচনা করা চলে না। বিবাহের কোনো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী আজো আবিষ্কৃত হয় নি। পাশ্চাতে এক শ্রেণীর নারী পুরুষের মধ্যে একগামী বিবাহ পরিহার করে একাধিক নারী পুরুষের একত্রবাস ও যৌথ যৌনজীবন যাপনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। কতিপয় নারী ও পুরুষ একগৃহে জোটবদ্ধ হয়ে বাস করে এবং নিজেদের মধ্যে পালা করে যৌন সংসর্গ করে। জোটের প্রতিটি পুরুষ প্রতিটি নারীর সঙ্গে যৌন মিলনে লিপ্ত হয় এবং প্রত্যেক নারী প্রত্যেক পুরুষের অঙ্কশায়িনী হয়। সবকটি নারী ও সবকটি পুরুষ মিলে যেন একটি যৌথ পরিবার। এ ধরনের জোটের সদস্যরা নিজেদের ঐচ্ছিক সম্প্রদায় বলে পরিচিতি দেয়।

এই ব্যবস্থায় কয়েকটি সুবিধা দাবি করা হয়ে থাকে। একজন নারী ও একজন পুরুষ পরস্পরের সঙ্গে আবদ্ধ থাকলে একঘেয়েমী দেখা দেয় ;

তাদের কোনো বিষয়ে মতভেদ হলে দাম্পত্য শান্তি বিঘ্নিত হয়। পরিণামে ডিভোর্স এবং তার আনুষাঙ্গিক সমস্যার উদ্ভব হয়। কিন্তু কয়েকজন নারী পুরুষ কয়েকজন পুরুষ পরস্পরের মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলে একঘেয়েমী আসতে পরে না ; বরং জীবন বৈচিত্র আসে। দুজনের মধ্যে মতের মিল না হলেও ক্ষতি হয় না ; সবাই মিলে সমস্যার সমাধান করে এবং সবার সাহচর্যে ও সহায়তায় ব্যক্তিগত মনকষাকষি মিটিয়ে ফেলা যায়। কাজেই ডিভোর্স ও তার আনুষঙ্গিক আর্থিক ও মানসিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য বারোয়ারী ব্যবস্থা উত্তম বলে দাবি করা হয়ে থাকে। একগামী বিবাহের সন্তান মাত্র একজোড়া পিতামাতার স্নেহ ও ভালোবাসা পায়, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত মাত্র দুজন ব্যক্তির ওপর নির্ভর করে, ফলে ভুল সিদ্ধান্তের অবকাশ থাকে। যৌথ ব্যবস্থায় সন্তান অনেকগুলো পিতামাতার স্নেহ ও ভালোবাসা লাভ করে , সে একটি বৃহত্তর এবং উদারতর পরিবেশে মানুষ হয় ; তার ভবিষ্যৎ গঠিত হয় কতিপয় নরনারীর সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের দ্বারা। সন্তানের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণের জন্য যৌথ ব্যবস্থা অধিকতর ফলপ্রসূ হবার সম্ভাবনা থাকে।

কিন্তু সমবেতভাবে যৌন জীবন যাপন যতগুলো সমস্যার সমাধান করে তার চেয়ে বেশি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করে। কথায় বলে অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়। নানা লোকের নানা মত। একজোড়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মত পার্থক্য হয় দুটি মতের মধ্যে, তাই সমন্বয় ও সমঝোতায় পৌঁছানো অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যেখানে চারজোড়া মেয়ে পুরুষ একত্রে বাস করে সেখানে আটটি মতের উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয় এবং একটি ঐক্যমতে পৌঁছানো যথার্থই কষ্ট সাধ্য। চারজোড়া নারীপুরুষের মন মানসিকতা ও ধ্যান ধারণা অভিন্ন হবে, তারা একমত ও পথের অনুসারী হবে — এ সম্ভবনা সুদূর পরাহত। কেউ হয়ত ফুলবাবু ; কেউ নোংরা কেউ বা কর্মঠ এবং উদ্যোগী। আবার কেউ অলস ও কর্মবিমুখ। কাজেই ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের অনেক লোকের একত্র বাস স্থায়ী হতে পারে না।

সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রায় সব যৌনজোটই ক্ষণস্থায়ী। এ ধরনের জোট আজ হোক কাল হোক ভেঙে যায়।

এক পরিবার হয়ে বাস করতে হলে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিকতা একান্ত অপরিহার্য। এক ব্যক্তির সঙ্গে এক বা দুজনের গভীর আন্তরিকতা গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু একসঙ্গে অনেক ব্যক্তির সঙ্গে একই পর্যায়ে আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন ও পোষণ করা সহজ নয়। তাই অধিকাংশ বারোয়ারী যৌন সম্পর্ক দৃঢ়বদ্ধ হয় না। জোটগুলো যে অল্পসময় বাঁচে তার মধ্যেই আবার সদস্য বদল হয়। সব সময়ই কিছু লোক যোগ দেয়, আবার কিছু লোক বেড়িয়ে যায়।

দল যত ভারি হবে নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন তত বৃদ্ধি পাবে এবং নেতৃত্বের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেবে। একজোড়া দম্পতি মিলে মিশে চলতে পারে, কেউ কাউকে ছাপিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু যেখানে অনেকের সমাগম সেখানে কাউকে নেতৃত্ব দিতে হবে। দুর্ভোগ্যবশত অধুনা সৃষ্টি যৌথ সম্প্রদায়গুলোতে এই নেতৃত্ব পুরুষের হাতে কেন্দ্রীভূত হতে দেখা গেছে। প্রচলিত সম্প্রদায়গুলোতে পুরুষ বাইরে কাজ করে, নারী গৃহকর্মে ফিরে যায়। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে সম্প্রদায়যুক্ত নারীরা পুরুষের আধিপত্য মেনে নেয়।

বারোয়ারী যৌনজীবন যাপনের আর একটি প্রতিবন্ধক মানুষের ঈর্ষাপ্রবণতা। বিজ্ঞানের প্রয়োগে মানুষ অসম্ভবকে জয় করেছে, কিন্তু নিজের অন্তর্নিহিত ঈর্ষাকে জয় করতে পারেনি। নারী পুরুষের সম্পর্কের মধ্যে যে ঈর্ষা আছে তা সম্পূর্ণভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে জোটের সকল পুরুষের সকল নারীর প্রতি এবং সকল নারীর সকল পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও ভালোবাসা অভিন্ন হবে এ কল্পনা আকাশ-কুসুম। খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান ভাগ করে ভোগ করা যায়। কিন্তু মানুষ আজো ভালোবাসা ভাগ করে ভোগ করতে শেখে নি। তাই দেখা গেছে যে, অল্প যে কটি জোট বেশ স্থায়ী হয়েছে সেখানে প্রাথমিক যৌন উদ্দামতা শেষ হবার পরে একজন পুরুষ একজন নারীর সঙ্গে প্রায় একগামী পর্যায়ে সম্পর্ক গড়ে

ক্ষেত্রে, কোথাও মিশরীয় স্ত্রী স্বামীর ওপর কর্ত্রী নয়। স্বামীই পরিবারের প্রধান। ফারাও পুরুষ এবং ফারাও এর পুত্র পিতার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কন্যা নয়। সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব পিতার। পরিবারের জীবিকা অর্জনের দায়িত্ব স্বামীর, স্ত্রীর ওপর ছিল ঘরকন্নার ভার। স্ত্রীকে পেট পুরে আহার দান ও পরিধানের বস্ত্র প্রদানের দায়িত্ব পুরুষের। পিটা হোটেপ পরামর্শ দিয়েছেন, "স্ত্রীকে একান্তভাবে ভালোবাসো, তাকে পেট পুরে আহার দাও এবং পরিধানের বস্ত্র দাও। . . . তাকে প্রসাধন দাও এবং আজীবন সুখী রাখতে চেষ্টা কর। . . . তার বাসনা পূর্ণ করো। সে কি আশা করে তা লক্ষ্য কর। . . . মোট কথা স্ত্রী ছিল পুরুষের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ব্যবিলনে স্বামী স্ত্রীকে বিক্রয় করতে পারত এবং ঋণের বিনিময়ে উত্তমনের কাছে স্ত্রীকে হস্তান্তর করতে পারত। গ্রিসে স্ত্রীর ওপর স্বামীর সর্বময় ক্ষমতা ছিল। স্বামী কপিত হলে স্ত্রীকে হত্যা করতে পারত ; মৃত্যর আগেই বিধবা স্ত্রীর ভাবী স্বামী নিযুক্ত করতে পারত। গ্রিক সমাজে মেয়েদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল গৃহের অভ্যন্তরে এবং রান্নাঘরে। তারা গৃহে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করত। পর পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীর সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ ছিল। মৃত স্বামীর সম্পত্তিতে বিধবা স্ত্রীর কোনোও অধিকার ছিল না, নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ ছিল। রোমে নারীর অবস্থার কিছুটা উন্নত হয়েছিল, তাদের গৃহে অবরুদ্ধ জীবন যাপন করতে হতো না কিন্তু আইনের চোখে স্ত্রীর কোনো স্বাধীন সত্তা স্বীকৃতি হয় নি, প্রত্যেক নারী বাধ্যতামূলকভাবে একজন স্বামী বা অভিভাবকের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল। গ্রিসে যেমন রোমেও তেমনি বিয়েতে প্রেম ভালোবাসার স্থান ছিল না। পিতামাতা সন্তানের বিয়ে স্থির করত। শৈশবে শিশু সন্তানদের বাক্‌দান করা হতো। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় স্বামী স্ত্রীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, স্ত্রী বিনা প্রতিবাদে স্বামীর আদেশ মান্য করতে বাধ্য হয়। এমনকি কুলাঙ্গার স্বামীর স্ত্রীকে লম্পট স্বামীর প্রতি ভক্তিমতী ও অনুগত থাকতে উপদেশ দেয়া হয়। বস্তুত স্ত্রীর স্বাধীন সত্তা এখানে স্বীকৃত নয়। "শৈশবে পিতা তাকে রক্ষা

করে, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্র, স্ত্রীলোক কদাপি স্বাধীনতার উপযক্ত নয়” (মন)। বিবাহিত নারীর স্বামী অলঙ্কার, স্বামী ছাড়া তার অস্তিত্ব নেই — সতীদাহ প্রথা তারই পরিচায়ক। হিন্দু স্ত্রীকে স্বামীর সাথে সহমরণে যেতে হতো।

কিন্তু এই অবস্থা চিরস্থায়ী হয়নি। আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আজকের গ্রিস ও রোম তথা সমগ্র পাশ্চাত্য বিশ্বে প্রেম ও ভালোবাসা বিয়ের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। সেখানে পিতামাতা সন্তানের বিয়ে স্থির করে না। যুবক–যুবতী নিজেদের মনমতো সাথী নিজেরাই খুঁজে নেয়। একজোড়া তরুণ–তরুণীর মধ্যে মন দেয়া নেয়া হলেই কেবল বিয়ে হতে পারে, পিতামাতার অভিমত সম্পূর্ণ অবান্তর। আজকের পাশ্চাত্যে স্বামী স্ত্রীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়। আজকের স্ত্রী অন্ত:পুরে বন্দি নয়, শুধু মাত্র গৃহ কর্মে নিয়োজিত নয়। কাজেই প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিয়ে টিকে আছে, কিন্তু তার আঙ্গিকে পরিবর্তন হয়েছে।

প্রাচ্য অবশ্য এখনো বিয়েতে পিতামাতার মুখ্য ভূমিকা আছে, এখানে এখনো স্ত্রীকে স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। তবে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে। ক্রমে ক্রমে পিতামাতা বিয়ের ব্যাপারে সন্তানের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়কে মূল্য দিতে শিখছেন ; তরুণ–তরুণীর মন দেয়া নেয়া ঘটছে এবং সমাজে তা স্বীকৃতি পাচ্ছে। বর্তমান ধারা যে বিস্তার লাভ করবে তার কারণ প্রাচ্যেও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটছে। রাষ্ট্রীয় জীবন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এখন সকল দেশেই কমবেশি স্বীকৃত সত্য। এই গণতন্ত্র রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত হলে তার ঢেউ সামাজিক জীবনে এসে লাগতে বাধ্য। তরুণ সমাজ যতই গণতন্ত্রের কথা জানতে পারবে, ততই তারা অধিকার সচেতন হবে, তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধ পাবে। গণতন্ত্র এখন রাষ্ট্র থেকে ব্যক্তিগত জীবনে বিস্তার লাভ করবে এবং তরুণ–তরুণীর ইচ্ছাই তখন বিয়ের একমাত্র ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

গণতন্ত্রের বিকাশ আর একভাবে বিবাহ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সত্যিকার গনতন্ত্রে সকল মানুষের সমান

অধিকার ও সমান সুযোগ অপরিহার্য। তাই গণতন্ত্রে নারী পুরুষের আপেক্ষিক অবস্থানেরও গণতন্ত্রায়ন অবশ্যম্ভাবী।

নারী পুরুষের পদানত থাকবে, সে ব্যবস্থা এখন অচল। গণতন্ত্রের বিকাশে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার ও সমমর্যাদা অপরিহার্য। যুগযুগ ধরে পদদলিত নারী পুরুষের সমপর্যায়ে উত্থান সহজ নয়। সমাজের বদ্ধ-মূল ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত অসমতা একদিনে দূর হবার নয়। তবে নারী সমাজের যুগান্তকারী বিজয় অর্জিত হয়েছে — ভোটাধিকার অর্জনের মাধ্যমে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে এই শতাব্দীর শুরুতে ও দ্রুত উন্নয়নশীল পাশ্চাত্যে নারীর ভোট দানের অধিকার ছিল না। আজ শুধু পাশ্চাত্যে নয়।পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। দুনিয়া জুড়ে নারী সমাজ ও এই ভোটাধিকারের উপযুক্ততা অর্জনে সংকল্পবদ্ধ। তাই নারী আজ আর অশিক্ষার আঁধারে নিমজ্জিত নয়। পাশ্চাত্যে নারী ও পুরুষ শিক্ষার ব্যাপারে সমান সুযোগ ভোগ করে অতীতের মতো বহির্বিশ্ব আজ আর পুরুষের একচেটিয়া নয় ; সেখানে নারী দ্রুত নিজ স্থান চিনে নিচ্ছে। অর্থকরী কর্মের ক্ষেত্রে পুরুষ এখন রুটি রুজির একমাত্র মালিক নয়। নভোচারী থেকে ট্যাক্সী ড্রাইভার পর্যন্ত সকল কর্ম ও পেশা আজ নারী সমাজ গ্রহণ করেছে এবং পুরুষের চেয়ে তারা যে কোনো অংশে কম নয় তা প্রমাণ করছে শিক্ষা-দীক্ষায়, কর্মে পেশায় তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যে নারী সমাজ পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করে চলেছে।

প্রাচ্য দেশগুলোও পিছিয়ে নেই। আমাদের দেশে নারীশিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে, মেয়েরা গৃহের চার দেয়ালের বাইরে এসে নানা অর্থকরী কাজে নিয়োজিত হচ্ছে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে নারীর সংখ্যা বাড়ছে।

অদূর ভবিষ্যতে যে দুটি তরুণ-তরুণীর মধ্যে বিয়ে হবে তারা দুজনই হবে সমভাবে শিক্ষিক, দুজনই হবে স্বাধীন উপার্জনশীল, তাদের সমান রাজনৈতিক অধিকার থাকবে, দুজনই আইনের চোখে সমান মর্যাদা

ভোগ করবে। ভবিষ্যতের সেই বিয়েতে শাসক থাকবে না, থাকবে না শাসিত, প্রশ্ন, থাকবে না, তাবেদার তখন বিয়ে হবে দুই সমকক্ষের মধ্যে, দুই সম অংশীদারের মধ্যে। ভবিষ্যতে বিয়ের ভিত্তি হবে — নারী পুরুষের সমতা ও স্বার্থের একত্ব স্বামী–স্ত্রী হবে একে অপরের সাথী, একে অপরের পরিপূরক। নিরবিচ্ছিন্ন প্রেমের বন্ধনে তারা বাধা পড়বে, ভয়ভীতির বন্দিত্বে নয়, বিবাহিত জীবনে প্রয়োজনে স্বামী স্ত্রীর দায়িত্ব ও কার্যাবলির মধ্যে হয়ত শ্রম বিভাগ থাকবে, তবে এই ভাগাভাগি নির্ধারিত হবে পারস্পরিক মত বিনিময় ও সমঝোতার মাধ্যমে। প্রাত্যহিত জীবনে চলাফেরা, পানাহার, কাজকর্ম, আয়ব্যয়, সন্তান প্রতিপালন ও প্রেম ভালোবাসায় পরস্পরের ভূমিকা নির্ধারিত হবে — সম অংশীদারিত্ব ও সমতার ভিত্তিতে, প্রভুভৃত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে নয়। সমকক্ষ ও সম অংশীদারের মধ্যে বিবাহ মধুরতর ও সুন্দরতর হবে এমন ভবিষ্যদ্বাণী বিফল হবে না

গ্রন্থপঞ্জি

আহমেদ, নিজামউদ্দিন — পৃথিবীর আদিম সমাজ ১৯৭০

আহমেদ, ওয়াকিল — বাংলার লোক সংস্কৃতি।

Akanda, Latifa and Shamim, Ishrat — Women and violenc; A comparative study of Rural and urban violence on Women in Bangladesh 1984

Engels, F — The Origin of the Family, Private Property and the State 1884

Evans Pritchard — Kinship and Marriage among the Nuer 1950

Farber, Bernard — Family: Organisation and Interaction 1964

Harris, Marvin — Culture, Man and Nature, An Introduction to general Anthropology 1972

ইসলাম, মাহমুদা — নৃতত্ত্বের সমজপাঠ ১৯৭৪

Morgan, L.H. — Ancient Society 1977

Murdock G.P. — Social Structure in South East Asia 1960

Radcliffe Brow, A.R. and Forde, D (ed) — African Systems of Kinship and Marriage 1950

Westermarck,E — The History of Human Marriage 1894

. . . . এ গ্রন্থমালার বই সবার জন্যে। . . . .

একসময় বিয়ে নামক প্রতিষ্ঠান মানুষের অজানা ছিলো। আজ পৃথিবীর উন্নততম দেশগুলোতে কেউ–কেউ এ–প্রতিষ্ঠান বর্জনের পক্ষপাতি। এ–প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য এ–বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।